রাজ্যাদ্ ভ্রষ্ট ইহাগতঃ স নৃপতেঃ পার্শ্বে বভুবাশ্রিতঃ
মূলাযোড়পুরং দদৌ স নৃপতির্বাসায় গঙ্গাতটে ॥
তস্মৈ ভারতচন্দ্ররায়কবয়ে কাব্যাম্বুরাশীন্দবে।
ভাষাশ্লোককবিত্বগীতমিলিতং যত্নেন সম্বর্ণিতম্ ॥

[চণ্ডী এবং মহিষাসুরের আগমন]

খট্‌মট্ খট্‌মট্ খুরোত্থ-ধ্বনিকৃত-জগতী-কর্ণপূরাবরোধঃ
কোঁ কোঁ কোঁ কোঁতি নাসানিলচলদচলাত্যস্তবিভ্রান্তলোকঃ।
সপ্ সপ্ সপ্ পুচ্ছঘাতোচ্ছলদুদধিজলপ্লাবিত স্বর্গমর্ত্ত্যো
ঘর্ ঘর্ ঘর্ ঘোরনাদৈঃ প্রবিশতি মহিষঃ কামরূপো বিরূপঃ ॥
ধো ধো ধো ধো নাগারা গড় গড় গড় গড় চৌঘড়ী ঘোরগর্জ্জৈঃ
ভোঁ ভোঁ ভোরঙ্গ শব্দৈর্ঘন ঘন ঘন বাজে চ মন্দীরনাদৈঃ।
ভেরী তূরী দামামাদগড়দড়মসা স্তব্ধ নিস্তব্ধ দেবৈঃ
দৈত্যোঽসৌ ঘোরদৈত্যৈঃ প্রবিশতি মহিষঃ সার্ব্বভৌমো বভূব ॥

[মহিষাসুরের উক্তি]

ভাগেগা দেবদেবী	পাথর পাথর	ইন্দ্রকো বাঁধ আগে।
নৈঋতকো রীত দেনা	যমঘর যমকো	আগকো অগলাগে।
বায়োঁকো রোধ করকে	করত বরণকো	সব তুসো অব মাগে
ব্রহ্মা সোঁ বাসুকি সোঁ	কতি নেহি ঝগড়ো	জৌঠ কুবেরা না ভাগে।

[প্রজার প্রতি মহিষাসুরের উক্তি]

শোন্ রে গোঁয়ার লোগ্, ছোড় দে উপাস্ যোগ্, মানহ আনন্দ ভোগ,
ভৈঁষরাজ যোগমে।
আগমে লাগাও ঘিউ, কাহেকো জ্বালাও জিউ, এক রোজ প্যার পিউ,
ভোগ এহি লোগমে।
আপকো লাগাও ভোগ, কামকো জাগাও যোগ, ছোড় দেও যাগ যোগ,
মোক্ষ এহি লোগমে।
ক্যা এগান্ ক্যা বেগান, অর্থ নার আব জান, এহি ধ্যান এহি জ্ঞান,
আর সর্ব্ব রোগমে।

[এই বাক্যে ভগবতীর ক্রোধ, প্রথমে হাস্য করিলেন]

কমঠ করটট ফণিফণা ফলটট দিগ্‌গজ উলটট ঝগটট ড্যায়রে
বসুমতী কম্পত গিরিগণ নম্রত জলনিধি ঝম্পত বাড়বময় রে ॥
ত্রিভুবন ঘুটত রবিরথ টুটত ঘন ঘন ছুটত যেঙ পরলয়রে।
বিজলী চট চট ঘর ঘর ঘট ঘট অটঅটঅটঅট আঃক্যায়া হ্যায়রে ॥

অসম্পূর্ণ।

এই অসমাপ্ত নাট্যখানি ধ্বন্যাত্মক শব্দের প্রতি ভারতচন্দ্রের আত্যন্তিক অনুরাগের পরিচয় দিতেছে। সূত্রধার-কথিত সংস্কৃত শ্লোকে রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের উর্দ্ধতন চারি পুরুষের নাম, ভূরিশ্রেষ্ঠপুরে (ভূর-সুট) ভারতচন্দ্রের পিতার রাজত্ব, পরে তিনি রাজ্যভ্রষ্ট হইলে রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের নিকট ভারতচন্দ্রের আগমন ও বাসার্থ ভারতচন্দ্রের মূলা-যোড় গ্রাম প্রাপ্তি বর্ণিত হইয়াছে। নাটকে বাঙ্গলা ভাষার প্রয়োগ এই বোধ হয় প্রথম। কিন্তু 'চণ্ডী' নাটক বাঙ্গলা নাটক নয় বলিয়া ইহাকে বাঙ্গলা নাটকের মধ্যে ধরিতে পারা যায় না।

সর্ব্বপ্রথম [illegible]লা নাটক প্রণীত হইলেই যে তাহার অভিনয় হইয়াছিল, [illegible] আমরা প্রাচীন নাটক-নামধারী মুদ্রিত গ্রন্থ অনুসন্ধান [illegible]ত কলিকাতাস্থ ইউনাইটেড্ রিডিং রুম্স্ নামক পুস্[illegible]ম নাটক" ও "রমণী নাটক" নামে দুইখানি গ্রন্থ প্র[illegible]ক্ত দীনেশচন্দ্র সেন লিখিয়াছেন, "বাঙ্গলার আদি[illegible] প্রেম নাটক। কলিকাতা শ্যামপুকুরনিবাসী প[illegible] তাহার প্রণেতা"। আমরা যে প্রেম নাটক ও [illegible]থ করিলাম তাহা পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায়-রচিত [illegible] বলিতে আমরা যাহা বুঝি ইহার একখানিও তাহা [illegible]ন্থের নামের সহিত 'নাটক' শব্দ আছে বটে, কিন্তু [illegible]ইখানি কাব্য,—পয়ার ত্রিপদী প্রভৃতি ছন্দে রচিত। [illegible] গ্রন্থকারের নিম্নোদ্ধৃত আত্মপরিচয় হইতেই বুঝা

"যশোর জেলায় ধাম, দ্বিজ রামতনু নাম
কমলাপুর গ্রামে নিকেতন।
সাগরদহ বন্দ্যঘাটী কুলাংশেতে বড় খাঁটি
তাঁহার তনয় পঞ্চানন ॥"

[রমণী নাটক, ৯ম পৃষ্ঠা]

গ্রন্থ দুইখানি অতি জঘন্যরুচির পরিচায়ক কাব্য। পাত্রপাত্রী নাই। কথোপকথন-রীতিতেও লিখিত নহে। "কামিনীকুমার" প্রভৃতি যে সকল কদর্য্য পুস্তক ঐ সময়ে প্রকাশিত হইত, এ দুইখানিও সেই ধরণের। উভয় গ্রন্থের মলাট হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত হইল, ইহা হইতে পাঠক নিঃসন্দেহ বুঝিতে পারিবেন যে এগুলি নাটক নহে। দীনেশবাবু ইহাদের নামমাত্র শুনিয়া সম্ভবতঃ এই ভ্রমে পতিত হইয়া থাকিবেন।

"রমণী নাটক নামক গ্রন্থ।

কলিকাতা শ্যামপুষ্করিণীনিবাসী শ্রীযুক্ত পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক গৌড়ীয় সুসাধু সরল বঙ্গভাষায় পয়ারাদি বিবিধ প্রক[illegible]ভিনব ছন্দে দিব্য দিব্য নব্য কাব্য সহিত বিরচিত............সন ১২৫[illegible]ব্দাঃ ১৭৬৯, ইং ১৮৪৮ সাল।"

'রমণী নাটকে'র পর 'প্রেম নাটক' [illegible] হয়। ইহার মলাটে আছে :—

"প্রেম নাটক।

অর্থাৎ নায়কনায়িকাঘটিত আদিরসবর্ণন গ্রন্থ পঞ্চান[illegible] সন ১২৬০ সাল।"

এখন একটা কথা হইতে পারে যে পঞ্চানন [illegible] নামের সহিত 'নাটক' কথাটি ব্যবহার করিলেন [illegible] সংস্কৃত বা ইংরাজী কোনও নাটক পড়িয়াছিলেন, ইহা [illegible] সুতরাং নাটক কাহাকে বলে, এবিষয়ে তাঁহার কিছু [illegible]

ছিল বলিয়া বোধ হয় না। পূর্ব্বে আমরা বৈষ্ণব-সাহিত্যে যে সকল সংস্কৃত নাটকের কথা বলিয়াছি, সেগুলির বঙ্গানুবাদ হইয়াছিল। যদু-নন্দন দাস রূপগোস্বামীর "বিদগ্ধমাধব" ও "ললিতমাধবে"র, প্রেমদাস "চৈতন্যচন্দ্রোদয়ে"র ও লোচনদাস "জগন্নাথবল্লভে"র বঙ্গানুবাদ করেন। এই অনুবাদগুলি পাত্র-পাত্রীর কথোপকথনসমন্বিত অবিকল বঙ্গা-নুবাদ নহে। পয়ার ত্রিপদী প্রভৃতি ছন্দে কাব্যাকারেই নাটকগুলি অনূদিত হইয়াছিল, অথচ অনুবাদকগণ নামকরণের সময় 'নাটক' নাম বজায় রাখিয়াছিলেন। পঞ্চানন এই কাব্যাকারে অনুবাদিত নাটক দেখিয়া নাটকের লক্ষণ সম্বন্ধে একটা ভুল ধারণা পোষণ করেন ও পয়ারাদি ছন্দে লিখিত কাব্যকেও নাটক বলিতে পারা যায়,—এই বিশ্বাসে নিজের "রমণী" ও "প্রেম" নামক 'কাব্য' দুইখানির 'নাটক' নাম দিয়াছিলেন। যাহা হউক, এ দুইখানি গ্রন্থ যখন নাটকই নহে, তখন ইহাদের সম্বন্ধে অধিক আলোচনার কোনও প্রয়োজন নাই।

শ্রীশরচ্চন্দ্র ঘোষাল।

বিশ্ব-দর্পণে

কিবা স্বচ্ছ নিরমল এ মায়া-মুকুর,
যাহাতে বিম্বিত তব মূরতি মধুর!
উহারে স্বতন্ত্র করে লইব কি করি,
চূর্ণিয়া ফেলিলে শিস যাবে অপসরি।
তাই মুকুরে বিম্বিত ছবি, মুকুরে ধরিয়া,
হৃদয়-মুকুর মাঝে রেখেছি ভরিয়া।
শাস্ত্র-শস্ত্র লয়ে ওগো এস না এখানে
মিথ্যারে করিতে সত্য সহস্র বাখানে।
সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডব্যাপী যেই শক্তি মূল,
শাদ্বলে, প্রস্তরে, জলে, সেই শক্তি স্থূল
রয়েছে স্তম্ভিত ভাবে;—তাই কি তোমার
মানব, 'মানব' বলে এত অহঙ্কার!
এই যা রয়েছে মোর সর্ব্বাঙ্গ ভরিয়া,
উদ্ভিদে, চেতনে, জড়ে, নিখিল ব্যাপিয়া—
প্রাণ কি চেতনা কিবা কি আখ্যা না জানি,
একই আবেগে পূর্ণ সমগ্র মেদিনী।
তবে এর মাঝে কই—কোথা সেই আকর্ষণ,
যাহে একেতে বুঝিতে পারে অন্যের বেদন?
এক সূত্রে শত মুক্তা রহিয়াছে গাঁথা,
কেহ কারে নাহি চিনে—আশ্চর্য্য বারতা,
কত দিন রবে সুপ্ত—গুপ্ত এ মিলন,
কার ভেরী-রবে কবে হবে উদ্বোধন!

শ্রীমতী গিরিন্দ্রমোহিনী দাসী।

———

নারায়ণ

মাসিক পত্র ও সমালোচনা।

সম্পাদক

শ্রীচিত্তরঞ্জন দাশ।

প্রথম বর্ষ ১ম খণ্ড তৃতীয় সংখ্যা

মাঘ, ১৩২১ সাল।

সূচী পত্র

কার্য্যালয়—২০৮।২। ডি, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

বার্ষিক মূল্য ডাক মাশুল সমেত ৩।০ টাকা।

এই সংখ্যার নগদ মূল্য ।৶০ আনা, ডাক মাশুল ৵০ আনা।

নারায়ণ

১ম খণ্ড—৩য় সংখ্যা]　　　　[মাঘ, ১৩২১ সাল

রাসলীলা

১

ব্রজের মধুর রস যমুনার রূপ ধরি'
আজি কিবা বহি' যায় তর তর তর করি' !
প্রেমের পরশ আজি অতনু মলয় রূপে
নিকুঞ্জ-হৃদয়ে পশি' ঢালে মধু চুপে চুপে।
উথলি মধুর রসে কুসুমের মৃদু হিয়া
সৌরভের বেদনায় উঠিতেছে শিহরিয়া।
বিথারিছে উন্মাদনা কদম্বের নব দল,
দিশি দিশি ছুটিতেছে মল্লিকার পরিমল।
মাধবীর আলিঙ্গনে চূত-হৃদি মুকুলিত,
অকাল বসন্তোদয়ে বৃন্দাবন পুলকিত।
ধরণীর তপ্ত বুকে চন্দ্রিকা পড়িছে ঝরি'
প্রেমিকার প্রাণখানি আনন্দে উঠিছে ভরি'।
আকাশে অযুত তারা একটি নয়ন মত
পূর্ণিমার শশী-মুখে চেয়ে আছে মন্ত্র-হত।

২

বিভোরা বঁধুর প্রেমে চঞ্চল চরণে রাই
লুটায়ে অঞ্চলখানি পশিল সঙ্কেত-ঠাঁই।

ফুলময় তনুখানি প্রেম ভরে পড়ে ঢলি',
বঁধু-মুখ-সোঙরণে পুলকাশ্রু পড়ে গলি'।
সহসা অপূর্ব্ব ভাব অন্তরে উদিল তার,
বহু স্বাদ বঁধুয়ারে দিতে চাহে বার বার।
সকল সখীরে ডাকি' রাস-মঞ্চ বিরচিল,
আপনার হিয়াখানি সবারে বাঁটিয়া দিল।
অজ্ঞাতে সবার প্রাণে আকুল বাসনা জাগে,
রাধার হৃদয়-চাঁদে বাঞ্ছে সবে অনুরাগে।
যুগল-মিলন লাগি' আকুলা আছিল যা'রা,
শ্যামেরে ধরিতে হৃদে আজি পাগলিনী তারা!—
রাধার মনের ভাব অন্তরে জানিল বঁধু,
সহসা পারশে শ্যাম হেরে প্রতি ব্রজ-বধু।

৩

উতল বিভল হিয়া যতেক আভীরবালা
ভুলি' লাজ হের ধায় জুড়াতে হৃদয়-জ্বালা।
বঁধুরে হৃদয়ে নিয়া কেহ করে আলিঙ্গন,
নয়ন মুদিয়া কেহ করে রূপ দরশন।
অঙ্গের পরশে কার এলাইয়া পড়ে দেহ,
চুম্বন করিতে গিয়া চেতনা হারায় কেহ।
কেহ বা গায়িতে গান আপনা পাশরি যায়,
প্রেমে গদ গদ কণ্ঠ, অস্ফুট কূজন তায়।
আনন্দে নাচিতে গিয়া বিহ্বল চরণ কার
তাল মান লয় ভুলি' তিলেক না উঠে আর!
শ্যামের বাঁশরী কাড়ি' কেহ তায় পূরে তান,
'শ্যাম-শ্যাম-শ্যাম' নাম ফুটে তাহে অবিরাম।

প্রেমে ডগমগ দেহ, নীরে অন্ধ আঁখি দুটি,
বঁধুরে ধরিতে বুকে চরণে পড়িছে লুটি’!

৪

দূর হ’তে দেখি’ রাধা প্রেমানন্দে পুলকিত,
সে রাস-মণ্ডপ-ধূলি মাথে অঙ্গে বিমোহিত!
বহু স্বাদ বিনোদিনী বঁধুয়ারে দিল আজ,
একের পিরীতি বঁধু ভুঞ্জিল সবার মাঝ।
আজি রাই বিশ্বময় আপনারে করি’ দান
বহুর ভিতরে এক বঁধুরে করিল পান!
এক শশী কুমুদিনী, এক বঁধু বিনোদিনী,
রসের লহরে আজি বহুরূপ বিকাশিনী!

*　　*　　*　　*

অকস্মাৎ সে সম্মোহ টুটি’ গেল স্বপ্ন সম,
নিদ্রোত্থিত গোপীকুল অবিদিত অনুপম
সুখাবেশে আলুথালু অলস-অবশ-কায়
খুঁজিতে লাগিল সবে ত্রস্তে শ্যাম রাধিকায়।
কোথা না পাইয়া শেষে নয়ন মুদিল সবে,—
মিলিত যুগলরূপ মরমে ফুটিল তবে!

শ্রীভুজঙ্গধর রায় চৌধুরী।

সেকালের স্মৃতি।—বাজে কথা

১। বঙ্কিমচন্দ্র

তাহার পর পঁচিশ বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। কিন্তু সেদিনের কথা এখনও আমার মনে পড়ে। দুঃখের দিনেও মনে পড়ে, সুখের দিনেও মনে পড়ে। কুচিন্তা যখন উভয়কেই গ্রাস করে, তখনও মনে পড়ে; দুর্ব্বহ জীবনকে বহনীয় ও সহনীয় করে।

জীবনের স্মরণীয় দিনগুলির পর্য্যায়ে আনন্দময় পর্ব্বাহের মত আমার স্মৃতিপটে সে দিন উজ্জ্বল হইয়া আছে। সেই দিন প্রথম আমি নূতন বাঙ্গালার সাহিত্যগুরু বঙ্কিমচন্দ্রকে দেখি; তাঁহার কথা শুনি; তাঁহার পদধূলি গ্রহণ করিয়া ধন্য হই। সেই দিন প্রথম আমার বঙ্কিম-ভক্তি চরিতার্থ হয়। সে দিনের কথা কি ভুলিবার?

আমি ও মুন্সী—তখনকার মুন্সী—এখনকার জ্ঞানেন্দ্রনাথ গুপ্ত আই, সি, এস্,—রঙ্গপুরের ম্যাজিষ্ট্রেট—বঙ্কিম বাবুর দরবারে আমাদের আবেদন পেশ করিবার সঙ্কল্প করি। মুন্সী তখন "সাহিত্যে" আমার সহায় ছিলেন। এই সময়ে বঙ্কিম বাবুর কয়েক জন বন্ধুর সহিত আমাদের পরিচয় হইয়াছিল। অর্থাৎ, আমরা যাচিয়া তাঁহাদের সহিত আলাপ করিয়াছিলাম, এবং কাহারও স্নেহ, কাহারও সহানুভূতি, এবং কাহারও মৌখিক উপদেশ ও তদপেক্ষা সারগর্ভ প্রবন্ধও পাইয়াছিলাম। বঙ্কিম বাবুর সহিত আমাকে পরিচিত করিয়া দিবার জন্য আমি তাঁহাদের শরণাপন্ন হইলাম। কিন্তু আমার আবদার কেহ গ্রাহ্য করিলেন না। তাঁহারা পরিচয়-পত্র দিলেন না। দুই এক জন বলিলেন, "সে বড় কঠিন ঠাঁই! বঙ্কিম তোমাদিগকে আমল দিবেন না।" আর এক জন বলিলেন, "তোমরা নব্য ছোক্‌রা, বঙ্কিমের ধমক খাইয়া কি বলিতে কি বলিয়া বসিবে। অনর্থক এ হাঙ্গামে দরকার কি?"

এক জন বলিলেন, "বঙ্কিম বড় অহঙ্কারী। আমার সাহস হয় না।" বুঝিলাম, সই সুপারিস পাইব না।

কিন্তু তখন আমাদের নিরাশ হইবার বয়স নয়। "সাহিত্য" ভিন্ন অন্য চিন্তাও তখন ছিল না। আমি ও মুন্নী পরামর্শ করিলাম, যখন "রাজেন্দ্র-সঙ্গমে দীন যথা যায় দূর-তীর্থ-দরশনে" ঘটিল না, তখন এক দিন "one fine morne" আমরা দুই জনে বঙ্কিম বাবুর বাড়ীতে গিয়া তাঁহার সহিত দেখা করিবার চেষ্টা করিব।

এখন এই "one fine morne"এর একটু ইতিহাস না বলিলে আপনারা এই ইঁদুরের পরামর্শের মর্ম্ম বুঝিতে পারিবেন না। কবি-বর দেবেন্দ্রনাথ সেনের সহিত তখন আমার খুব ঘনিষ্ঠতা হইয়াছিল। পত্রযোগে তাঁহার সহিত পরিচয়; এবং পত্রে ও কবিতায় সেই পরিচয় ঘনিষ্ঠতায়—আত্মীয়তায় পরিণত হয়। তিনি তখন লক্ষ্ণৌ সহরে থাকিতেন। আমরা তাঁহাকে প্রত্যেক পত্রে কলিকাতায় আসিতে লিখিতাম। তিনিও প্রায় প্রত্যেক পত্রেই লিখিতেন, one fine morne তিনি আমাদের আড্ডায় আসিয়া আমাদিগকে বিস্মিত করিবেন। বহুদিন হইতে আমরা সেই one fine morneএর প্রতীক্ষা করিতেছিলাম। কিন্তু সেই fine morne আর আসিল না। কোনও কাজ ঠেলিয়া রাখিবার দরকার হইলে, বা সময়ে কোনও কাজ করিতে না পারিলে, আমরা তাহা দেবেন দাদার one fine morneএর পর্য্যায়ে ফেলিয়া দিতাম। বঙ্কিম বাবুর নিকট যাইবার ইচ্ছা যেমন প্রবল, তাড়া খাইবার আশঙ্কাও সেইরূপ সঙ্গীন হইয়া উঠিয়াছিল। সেই জন্য, উহাকেও আমরা সেই অনির্দ্দিষ্ট one fine morneএর তালিকাভুক্ত করিয়াছিলাম।

ইতিমধ্যে আর একটি ঘটনা ঘটিয়াছিল। মুন্নী আমার কনিষ্ঠ যতীশের সহিত একযোগে কোনও নব-যশস্বিনী মহিলা-কবিকে কাদম্বরীর ভাষায় "সাহিত্যে" লিখিবার জন্য পত্র লিখিয়াছিলেন। এবং তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে চাহিয়াছিলেন। মহিলা-কবি অপরিচিতের

অদ্ভুত পত্র পাইয়া বিস্মিত ও বিরক্ত হইয়া চিঠির কোণে লিখিয়া দিয়াছিলেন,—"দেখা হইবে না।" চিঠিখানি ফেরত আসিয়া লজ্জায় যতীশের দেরাজে লুকাইয়া ছিল! আমি সহসা একদিন তাহা আবিষ্কার করি। মুন্নী এখন ম্যাজিষ্ট্রেট, কিন্তু তখন কবি ছিলেন। সরল, উদার, ভাবুক কবি, সংসারের প্রহেলিকায় সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ, সাহিত্য-রসে ভোরপুর মুন্নীর ভাবোচ্ছ্বাস, এবং যতীশের বাছা বাছা সংস্কৃত কাদম্বরী পড়িয়া আমার খুব আমোদ হইয়াছিল, কিন্তু "দেখা হইবে না"—তেমনই সাংঘাতিক মনে হইল! কেন না, ইহার পর আর তাঁহার রচনা পাইবার আশা করা যায় না।

মুন্নীকে বলিলাম, হাঁড়ী ভাঙ্গিয়াছে, এইবার হাটে পাঠাইব। মুন্নীর সেদিনকার "লাজনত আঁখি" আমার এখনও মনে আছে!—অনেক বাক্‌বিতণ্ডার পর স্থির হইল, এ কাহিনী গুপ্ত থাকিবে।—আজ এ কথা ছাপিয়া দিলাম। জগৎ শেঠ বলিয়াছিলেন,—

"প্রতিহিংসা, প্রতিহিংসা, প্রতিহিংসা সার,
প্রতিহিংসা বিনা মম কিছু নাহি আর।"

ইহাও সেই প্রতিহিংসা। জীবনের প্রভাতে যাঁহাদের ভরসায় "সাহিত্যে" হাত দিয়াছিলাম, তাঁহারা এখন স্ব স্ব ক্ষেত্রে সাফল্য ভোগ করিতেছেন। সাহিত্যের ও "সাহিত্যে"র নামগন্ধও তাঁহাদের মনে নাই। আমি একাকী 'মড়া আগ্‌লাইয়া' বসিয়া আছি। মুন্নী "সাহিত্যে"র তদানীন্তন মুরুব্বীদের অন্যতম। প্রতিহিংসার সাধ হয় না? তাই সেই পৌরাণিকী বিড়ম্বনার কাহিনী ছাপিয়া শোধ লইলাম। আশা করি, Less majesty হইবে না!

তখন আর এক জন "সাহিত্যে"র উদ্যোগী, হিতৈষী, কর্ম্মী ছিলেন। তিনিও বিলাতে যান। সমুদ্রে ভাসিতে ভাসিতে "সাহিত্যে"র জন্য গদ্য-গান রচিয়া এডেন হইতে, সুয়েজ হইতে, মার্সাই হইতে ডাকে দিয়াছিলেন। বিলাত হইতে ফিরিয়া মালঞ্চে ফুলের

পর আইনের গোলকধাঁধায় প্রবেশ করেন।
ছে। তাঁহাকেও এত দিন পরে রোগে ধরিয়াছে।
সাগর-সঙ্গীত শুনিয়া শঙ্খের মত সমুদ্রের আরাব
লেন, দেশে আনিয়াছিলেন। চব্বি
রায়ণের চরণে সোনার তুলসী দিবার অ
তাঁহার সেবা সফল হউক। বন্ধুর অসুখ হইলে লো
, তুমি নীরোগ হও। আমি বলি,—তাঁহার এ রোগ যেন না
রে। এখন দেখুন,—কত ধানে কত চাল। এ নেশার কি
মাহ!

আমি এক দিন মুন্নীকে বলিলাম, "চল, বঙ্কিম বাবুর কাছে যাই
সেই "দেখা হইবে না" মুন্নীর মনে বেশ দাগ কাটিয়া, স্থায়ী হই
বসিয়াছিল। মুন্নী বলিল, "গলা-ধাক্কা খাইবার ইচ্ছা হইয়াছে?"
বলিলাম, "ষট্‌কর্ণ হইলে মন্ত্রভেদ হয়। তোমার আমার ধরিয়া
চারি কর্ণ, তাহাতে সে ভয় নাই। গলা-ধাক্কা দু'জনে ভাগ
লইব। কেহ প্রকাশ করিব না। চল।"

তৎক্ষণাৎ "সাহিত্য-কল্পদ্রুম" ও "সাহিত্যে"র কয়ে
লইয়া আমরা শঙ্কিতচিত্তে বঙ্কিম-দর্শনে যাত্রা করিলাম।

বঙ্কিম বাবুর সম্বন্ধে যাহা শুনিয়াছিলাম, তাহাতে তাঁহ
বলিয়াই মনে হইয়াছিল। যাহা ভাবিয়াছিলাম, ত
যাহা দেখিয়াছিলাম, তাহা ফুটিবে না।—এই জ
গৌরচন্দ্রিকায় এত 'বাজেতম কথা' লিখিতে
লিখিব, তাহাও খুব কাজের কথা নয়। কিন্তু
চরিত্রের অনেক বড় বড় তত্ত্ব জানা যায়। গ
বিচারণা তাহা অপেক্ষা বহুমূল্য হইতে পা
তাহাই একমাত্র উপাদান নয়।

এখন বঙ্কিম বাবুর বাড়ীতে যাত্রা ক
... বঙ্কিম বাবু মেডিকেল কলেজের

গলিতে বাস করিতেন। বাড়ীখানি সাদা সিধে
গলির উপর কাশ্মীরী বারান্দা ঝুঁকিয়া আছে।
আমরা পূর্ব্বাস্য হইয়া বাড়ীতে প্রবেশ করিলাম।
লের কল। সেই কলে বঙ্কিম বাবুর
আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "বঙ্কিম বাবু বা
উত্তরে জিজ্ঞাসা করিল, "আপনাদের কি দরকার?
চটিয়া লাল। বলিলাম, "বঙ্কিম বাবুর কাছে কি দরকার—তা তো
বলিব কি রে—? তাহা হইলে তোর কাছে আসিলেই চলিত। মর—
তুই খবর দে!"

মুন্নী আমার জামা ধরিয়া টানিতেছিল, এবং মৃদুস্বরে বলিতেছিল,
র কি? তোমার সঙ্গে কোথাও আসিতে নাই। এসেই দাঙ্গা!
চুপ্।" ইত্যাদি।

ঙ্কিম বাবুর খানসামা কি বলিতে যাইতেছিল, এখন সময়ে শুনি-
উপর হইতে কে বলিতেছেন,—"আপনারা উপরে আসুন।"
য়া দেখিলাম, প্রাঙ্গণের দক্ষিণে দ্বিতলের বাতায়নে এক
শু, মহাভুজ", গৌরবর্ণ সুপুরুষ—তাঁহার ডান হাতে বাঁধা
মাক খাইতেছিলেন,—প্রশান্ত মুখে স্নিগ্ধ স্মিতরেখা—উদার
ন কি দেখিয়াছিলাম, মনে নাই; কিন্তু এখন মনে
সুমের মালা নয়, মনীষার বেদী নয়, প্রতিভার কমলা-
াশীর্ব্বাদ।

"বাবু!"

বঙ্গদর্শনের বঙ্কিম, দুর্গেশনন্দিনীর বঙ্কিম, যাদু-
তাপ বঙ্কিম! হেমচন্দ্রের বর্ণনা মনে পড়িল,—
হসা প্রকাশ!" উপর হইতে তাঁহার ভৃত্যের
-কলহ বঙ্কিম বাবু দেখিয়াছেন। কিন্তু তখন

য়া দিল। বামে উপরে উঠিবার সিঁড়ি

উপরে উঠিলাম। ঘরের মেজেয় সুচিত্রিত কার্পেট পাতা। প্রাচী
অয়েলপেণ্টিং। বঙ্কিমচন্দ্রের পিতৃ-দেবতা ও তাঁহার নিজের ছবি
কৌচ্, কেদারা প্রভৃতি সুন্দর ও সুবিন্যস্ত। এক কোণে একটি
টেবিল-হারমোনিয়ম্। বঙ্কিমবাবু গৃহের মধ্যস্থলে দণ্ডায়মান। দ্বারের
দিকে একটু অগ্রসর। গায়ে একটি হাত-কাটা জামা। ধুতিখানি
কোঁচানো। পায়ে চটী। পরিপাটী ও পরিচ্ছন্ন। আমরা বাহিরে
জুতা খুলিয়া কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিলাম। সেই দিন, সেই প্রথম,
ভক্তিভরে অবনত হইয়া, বঙ্কিমচন্দ্রের পদধূলি গ্রহণ করিলাম। বঙ্কিম
বাবু বলিলেন,—"থাক্, থাক্।"

ইহার উত্তরে যাহা বলিবার ছিল, তাহা বলিতে পারিলাম না।
ঠিক মনেও নাই। এখনকার কথা তখনকার সেই মুহূর্ত্তের উপর
আরোপ করিলে আসর জমিতে পারে। কিন্তু তাহাতে কোনও লাভ
নাই। কেহ কেহ হামাগুড়ি দিবার সময় হঠাৎ নীল আকাশে চাহিয়া
অনন্তের কি মহিমা অনুভব করিয়া তেরো বৎসর বয়সে 'কাব্যি' লিখি-
বার কি পণ করিয়াছিলেন, তাহা পঞ্চান্ন বৎসর সাত মাস সতের দিন
সাড়ে একুশ ঘণ্টা পরে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। সকলের ভাগ্যে তাহা
ঘটে না। তবে একটা কথা বলিলে ক্ষতি নাই, আমাদের কৈশোরে
ভক্তি যেমন স্বাভাবিক ও সার্ব্বভৌমিক ছিল, এখন বোধ হয় আর
তেমন নাই। এখন ভক্তি হয় ত আরও গাঢ়, আরও সংহত, এবং
কতকটা উদ্দাম হইয়াছে। এখনকার ভক্তি গোঁড়ামীর গন্ধে ভোরপূর
—এ ভক্তি ভক্তকে উদার করিতে পারে না,—এক ভক্তি শত
ধারায় উচ্ছ্বসিত হইয়া ভক্তকে সহস্রের প্রতি ভক্তিমান করে না,
চিত্তকে স্নিগ্ধ করে না—সমাজকে শান্ত ও দান্ত করিতে পারে না।
এখনকার ভক্তির ক্ষেত্রে ভক্তির পাত্র ও ভক্ত ভিন্ন আর কাহারও
স্থান নাই;—যাহারা বা যাহা তাহার ক্ষুদ্র সীমার অন্তর্গত নয়, তাহা
মহান্ হইতে পারে, স্বর্গীয় হইতে পারে, কিন্তু অন্ধ ভক্তির ও তাল-
কাণা ভক্তের পক্ষে এ জগতে তাহার অস্তিত্বই নাই। ভক্তির ক্ষেত্রে

দেশের সাহিত্য অঙ্কুরিত হইয়াছিল, সেই দেশের সংস্কারে সিন্ধদের স্কন্ধবিহারী বুড়ার মত এই নাটুকে সাহিত্য-ভক্তি ভর করিয়াছে। ভক্তির এই কারাদণ্ড দেখিয়া আমরা ত সুখী হইতে পারি না।

বঙ্কিম বাবু বলিলেন,—"বসুন"। আমরা দাঁড়াইয়া রহিলাম। বঙ্কিম বাবু না বসিলে আমরা বসিতে পারি না। অবস্থা ঠিক—"ন যযৌ ন তস্থৌ"! বঙ্কিম বাবু অঙ্গুলিনির্দ্দেশে একখানি কৌচ্ দেখাইয়া দিলেন। আমি বলিতেছিলাম,—"আপনি দাঁড়াইয়া—"

কথা শেষ করিতে না দিয়া বঙ্কিম বাবু বলিলেন, "আমার বাড়ী,—আমি বেশ আছি, আপনারা বসুন।" আমি বলিলাম, "আমাদের 'আপনি'—বলিবেন না। আমাদের অপরাধ হয়।" বঙ্কিম বাবু একটু হাসিলেন, বলিলেন "আচ্ছা, বসো"।

আমরা সেই কৌচে বসিলাম। মনে একটু ভরসা হইয়াছিল; বঙ্কিম বাবু বাঘ নন, বাঙ্গালার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক, হাসিয়া হাসিয়া কথা কন; গলা-ধাক্কার সম্ভাবনাও অসম্ভব বলিয়া মনে হইতেছে!

আমাদিগকে নীরব দেখিয়া বঙ্কিম বাবু বলিলেন, "তোমাদের দু'জনকেই আমি জানি। তুমি ত বিদ্যাসাগরের দৌহিত্র? তোমার নাম সুরেশ, নয়?"

আমি বলিলাম, "আজ্ঞে হাঁ।"

আমি বিস্মিত হইয়া বঙ্কিম বাবুর মুখের দিকে চাহিয়া রহিলাম। বঙ্কিম বাবু বলিলেন, "তোমার আশ্চর্য্য মনে হইতেছে? সেদিন দীনবন্ধুর পৌত্রীর বিবাহে নিমন্ত্রণ রাখিতে গিয়াছিলাম। দরজার কাছে তুমি, তোমার সঙ্গে বন্ধুদের মজলিস্ করিতেছিলে। আমাদের হেমকরের ছেলে পন্টুও তোমাদের সঙ্গে ছিল। তোমাদের আমোদ দেখে আমাদের ছেলেবেলা মনে পড়ে গেল। দেখ্‌লুম, তুমিই জমিয়ে রেখেছ। শরৎকে জিজ্ঞাসা করে শুনলুম, তুমি বিত্তাসাগরের নাতী, তোমার নাম সুরেশ। পরে বঙ্কিমকে বল্‌লুম তোমাকে ডাক্‌তে।

বঙ্কিম যাচ্ছিলেন,—আমি আবার বল্লুম,—ওরা আমোদ কর্‌ছে,—করুক; ডেকো না, বুড়োর কাছে এসে কি হবে? এখানে থেকেই ওদের হাসি তামাসা দেখি।”

দীনবন্ধু সেই দীনের বন্ধু, নীলকরের যম, বাঙ্গালীর প্রাতঃস্মরণীয় স্বর্গীয় রায় দীনবন্ধু মিত্র বাহাদুর! শরৎ তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র। বঙ্কিম তাঁহার তৃতীয় পুত্র,—এখন বঙ্গসাহিত্যে সুপ্রতিষ্ঠ, বর্ত্তমানে সুকবি ও দার্শনিক, কলিকাতার ছোট আদালতের জজ। পণ্টু,—পি, সি, কর, ওরফে প্রমথচন্দ্র কর, কলিকাতা হাইকোর্টের অ্যাটর্ণী, অধুনা লোকান্তরিত হেমচন্দ্র কর মহাশয়ের পুত্র। হেমবাবুও ডেপুটী ছিলেন, বঙ্কিম বাবুর সমকর্ম্মী।

তাহার পর মুন্নীর দিকে ফিরিয়া বলিলেন, “তোমাকেও আমি জানি। তোমার বাপ ঘনশ্যামের সঙ্গে আমার অনেক দিনের আলাপ। তুমি যেবার বি, এ, দাও, সেবার আমিও ইউনিভার্সিটি-হলে গিয়াছিলাম। কোঁকড়া কোঁকড়া বাবরী চুল, এত অল্প বয়সে বি, এ, দিচ্ছ দেখে ত্রৈলোক্যকে জিজ্ঞাসা কর্‌লাম, ‘এ ছেলেটি কে হে? খুব অল্প বয়সে বি, এ, দিচ্ছে ত? চেনো?’ ত্রৈলোক্য বল্লে,—‘ঘনশ্যামের ছেলে।’ তোমার ডাকনাম মুন্নী? ভাল নাম কি?”

মুন্নী বলিল, “জ্ঞানেন্দ্রনাথ গুপ্ত।”

বঙ্কিম বাবু বলিলেন, “তুমি কি কচ্ছ?”

মুন্নী বলিল, “আমি এম্, এ, দিয়াছি।”

আমি বলিলাম, “ও আবার এম্, এ, দেবে বলে পড়্‌ছে। আমরা বল্‌ছি, তুমি বিলেতে যাও, সিভিলিয়ান্ হবার চেষ্টা কর।”

বঙ্কিম বাবু বলিলেন, “ওর বাবা কি বলেন?”

আমি বলিলাম, “তাঁর অমত নাই। বঙ্কিম বাবু বলিলেন, “তবে আবার এম্, এ, কেন?”

তার পর আমার দিকে চাহিয়া বলিলেন, “তোমার হাতে কি?”

আমি অবসর পাইয়া কম্পিত-হস্তে সেই “সাহিত্য-কল্পদ্রুম” ও কল্প-

ক্রম-কাটা "সাহিত্য" বঙ্কিম বাবুর হাতে দিলাম। বঙ্কিম বাবু হাসিতে হাসিতে গ্রহণ করিয়াই বলিলেন, "আগেই বলে রাখি, তোমরা যদি আমাকে কালীঘাটে নিয়ে গিয়ে বলি দাও, তাতেও আমি রাজী আছি। কিন্তু আমাকে তোমাদের কাগজে লিখ্‌তে বলো না।"

গলা-ধাক্কা বটে! কিন্তু কি সুন্দর, কি মিষ্ট প্রত্যাখ্যান! যে আশায় গিয়াছিলাম, তাহাতে ছাই দিয়া, সুবুদ্ধির মত তখনই বলিলাম, "যে আজ্ঞে!"

দু'জনে আড়ষ্ট হইয়া বসিয়া রহিলাম। অসাধ্যসাধন করিতে পারিলাম না। কিন্তু আমার মনে হইল, ফাঁড়াটা অতি অল্পেই কাটিয়া গেল।

বঙ্কিম বাবু "সাহিত্য" সম্বন্ধে দুই চারিটি প্রশ্ন করিলেন। মুন্নী বলিল, "সুরেশকে আমরা সম্পাদক করিয়াছি"।

বঙ্কিম বাবু আমাকে বলিলেন, "তোমার দাদা-ম'শায় জানেন ?"

আমি বড় বিপদে পড়িলাম। দাদা-ম'শায় জানেন কি না, তাহা আমিও ঠিক জানিতাম না। তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করি নাই। এখন ভাবি, জিজ্ঞাসা করিলে ভাল হইত। খুব সম্ভব, তিনি আমাকে এমন অনধিকার-চর্চ্চা করিতে দিতেন না। বাড়ীতেই আফিস ছিল। লুকাইবার জিনিষ নয়, হয় ত শুনিয়া থাকিবেন, বারণ করেন নাই। মুন্নী বলিল, "বোধ হয়, তিনি জানেন।"

বঙ্কিম বাবু আমাকে বলিলেন, "সে কি ? দেশের লোক তাঁর পরামর্শ নিয়ে কাজ করে, আর তুমি তাঁকে না বলে' কাগজ বার করে' ফেল্লে। তিনি শুনলে রাগ করবেন না ?"

আমি বলিলাম, "বোধ হয় শুনেছেন। কিন্তু আমি জিজ্ঞাসা করি নি।"

বঙ্কিম বাবু বলিলেন, "দেখ, লেখা টেখা মন্দ নয়। কিন্তু তোমাদের এখন পড়্‌বার সময়—এতে অনেক সময় নষ্ট হয়। জীবিকার জন্যে ত কিছু করা চাই। এতে উপার্জ্জনের আশা নাই। আমরা

কলেজ থেকে বেরিয়ে এ সব কাজ করেছি। এই চাকরী কর্‌তে কর্‌তেই লেখার জন্যে ছুটী নিয়ে এখন ভুগ্‌ছি। এতদিন পেন্সন নেওয়া যেতো,—আর ভাল লাগে না, শরীরও বয় না, কিন্তু সেই ছুটীগুলো এখন পুষিয়ে দিতে হচ্ছে।”

বঙ্কিম বাবু তখনও পেন্সন গ্রহণ করেন নাই।—আমি নিরুত্তর।

মুন্নী আমাকে উদ্ধার করিল। সে বলিল, “বিদ্যাসাগর ম’শায় ওদের দু’ ভাইকে স্কুলে দেন নি। বাড়ীতে পড়ান।”

বঙ্কিম বাবু বলিলেন, “কেন? তাঁর নিজের স্কুল কলেজ রয়েছে, নাতীদের স্কুলে পড়ান না? এর মানে কি?”

মুন্নী বলিল, “তিনি ওদের সংস্কৃত পড়িয়েছেন। তাঁর মত, আগে সংস্কৃত পড়ে, পরে ইংরিজী পড়্‌লে শীঘ্র শেখা যায়। ওরা বাড়ীতে পড়ে। তিনি বলেন, ভাল করে’ পড়া শুনা করে’ ওরা বাঙ্গালা লিখ্‌বে। তিনি নিজে সময় পান নি, যা সাধ ছিল, লিখ্‌তে পারেন নি। ওদের দিয়ে লেখাবেন।”

বঙ্কিম বাবু বলিলেন, “তবে ভাল।”

আমি যেন হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিলাম!

বঙ্কিম বাবু বলিলেন, “আমি লিখিতে পারিব না, কিন্তু তোমাদের যখন যা জান্‌বার দরকার হবে, জেনে যেও; আমি অনেক দিন ‘বঙ্গদর্শন’ চালিয়েছি। সব জানি। ম্যানেজারী পর্য্যন্ত।”

আমরা উঠিলাম। আবার বঙ্কিম বাবুর পদধূলি লইয়া ধীরে ধীরে ফিরিলাম। “সাহিত্যে”র দুর্ভাগ্য ভাবিয়া নিরাশ হইয়াছিলাম, কিন্তু বঙ্কিম বাবুর সদাশয়তায় মুগ্ধ—আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া গৃহে ফিরিলাম।

মুন্নী বলিল, “একবারে ‘যে আজ্ঞে’ বলে ফেল্লে? এ দিকে মুখে খই ফোটে, একটা কথাও কইতে পার্‌লে না?”

আমি বলিলাম, “তুমিই কোন্ পার্‌লে?”

সেই দিন হইতে তিন দিন তিন রাত্রি বঙ্কিম বাবুর warning-এর কথা ভাবিতে লাগিলাম। জীবিকা, দারিদ্র্য, বিফলতা,—নানা

শঙ্কায় মন বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল। আমি ঘড়ীর পেণ্ডুলমের মত দু'দিকে দুলিতে লাগিলাম।

তৃতীয় রজনীর শেষ যামে স্থির করিলাম,—"যে কাজের সূত্র-পাতেই বঙ্কিম বাবু আমার ভবিষ্যৎ ভাবিলেন, অদৃষ্টে যাহা ঘটে, ঘটুক, সে কাজ ছাড়িব না।"

বাগান হইতে বেল, জুঁই, চামেলী, গন্ধরাজ, বকুলের গন্ধ ভাসিয়া আসিতেছিল। চন্দ্রকিরণে মৃদু-বিভাসিত উদ্যানের সৌম্য শ্যাম শ্রী আমার স্বপ্নকে আরও সুন্দর করিতেছিল। কিশোর বয়সের কল্পনা আশার যবনিকায় আমার অক্ষমতা, বিফলতা ঢাকিয়া রাখিয়াছিল! জীবন বিফল হইয়াছে, সে আশা ধূলায় লুটাইয়াছে,—কিন্তু অতীতের স্মৃতি আছে। এখন আমার পক্ষে তাহাও সুন্দর। জানি, পাঠকের পক্ষে নয়। কিন্তু সেই স্মৃতির চিত্রশালা হইতে ক্ষুদ্রের প্রতি বঙ্কিম-চন্দ্রের স্নেহ, তাহার তুচ্ছ ঘটনা মনে করিয়া রাখিবার স্মৃতি আজ আহরণ করিয়া দিলাম। যদি পাঠকের মনের মত ও সম্পাদকের অনুমত হয়, পরে আরও বলিব।

শ্রীসুরেশ সমাজপতি।

ভাষার কথা

বাংলা ভাষার স্বরূপ নিয়ে কিছুদিন যাবৎ একটা মহা তর্ক উঠেছে। একদল বল্‌ছেন যে ভাষাটা সংস্কৃত ভাষারই রূপান্তর এবং বাংলা ভাষার উন্নতি মূল সংস্কৃত অনুযায়ী হওয়া উচিত। যতক্ষণ আমরা সংস্কৃতের আদর্শ আমাদের সাম্‌নে রাখ্‌ব ততক্ষণ ভুল ভ্রান্তি এড়িয়ে উন্নতির পথে অগ্রসর হতে থাক্‌ব। শব্দটী যতই ব্যবহার হ'ক না কেন, যেখানে সংস্কৃতের সঙ্গে মিল হবে না সেখানেই ভুল হবে এবং আমাদের সেরূপ শব্দ এবং বাক্য ত্যাগ কর্‌তে হবে। চল্‌তি কথার আমদানীটা নেহাতই গ্রাম্যতার পরিচয় দেয়, ভাষাটাকেও ক্রমশঃ শ্রীহীন ও আবিল করে ফেলে এবং লেখকদের উচ্ছৃঙ্খলতা বৃদ্ধি করে। এই জন্য ফ্রান্সে Academy আছে। সেখানে পণ্ডিতেরা কথার উপর যখন ছাপ মেরে দেন তখনই সেটা সাহিত্য-বাজারে চলে। আমাদের পূর্ব্বপুরুষের তৈরী সংস্কৃত ভাষাটাই সেই Academyর কাজ করে—আমাদের একটা আলাদা পণ্ডিত-সমাজ গঠন করে নিতে হবে না। সংস্কৃত নিয়ম মাফিক যে শব্দ চলে সেইটাই গ্রাহ্য—অন্য শব্দগুলার জাত নাই—কাজের জন্য যতই দরকার হ'ক না কেন; তারা এক পংক্তিতে আসন পাবার যোগ্য নয়।

আর একদল বলেন যে সংস্কৃত ভাষাটা যদিও মাতৃভাষা বটে, তবুও বাংলা ভাষার একটা স্বাতন্ত্র্য আছে। মেয়ে হলেও সে এখন অন্য গোত্র-ভুক্ত হয়েছে। তার উন্নতির নিয়ম সংস্কৃত নিয়ম অনুসারে হবে না। পার্শী, ইংরাজী ও নানাবিধ দেশজ অনার্য্য ভাষার মিশ্রণে বাংলা তৈরী। তাকে জোর করে সংস্কৃত নিয়মে বদ্ধ কর্‌লে রীতিমত শৃঙ্খলিত করা হবে—তার উন্নতি হওয়া দূরে থাক, বাঁচা দায় হবে জীবন্ত ভাষার ছাঁচ—জাতীয় জীবন; যেখানে নানাবিধ উপকরণে যে জাতীয় জীবন গঠিত সেখানে জাতীয় ভাষাতেও জীবনের ছায়া দে

যাবে। জীবন-সংগ্রামে জাতিই বল বা ভাষাই বল—যে যত পারিপার্শ্বিক অবস্থার সঙ্গে মিল করে নিতে পার্‌বে সে ততই জীবনীশক্তি লাভ কর্‌বে। সংস্কৃতের নিয়মগুলা বাংলার উপর সিন্ধবাদ নাবিকের স্কন্ধে দ্বীপবাসী বৃদ্ধের মত চড়িয়া বসিলে বেচারার প্রাণ সংশয় হবে।

সংস্কৃত ওয়ালাদের প্রথমেই কিন্তু একটা বিষম সমস্যা। সংস্কৃত থেকে যে আমরা বাংলার উৎপত্তি ধরে নিচ্ছি সেটাই গোড়ায় গলদ। প্রাকৃত ভাষা থেকে বাংলা জন্মেছে, আর সে প্রাকৃত ভাষা যে সংস্কৃত ভাঙ্গা নয়, এটা সকলেই এখন জানেন। আজকাল আবার এমন দাঁড়িয়েছে যে, অনেকেই সন্দেহ করেন যে সংস্কৃত ভাষাটার আদৌ মৌখিক ব্যবহার ছিল কি না। কালিদাস, ভারবি, অমরসিংহের ভাষাটা কেবল লেখাতেই চল্‌ত, লোকে কহিত কিন্তু নানা রকমের প্রাকৃত ভাষা। পণ্ডিত Rhys David প্রভৃতির মত এই যে, সংস্কৃত ভাষা কোনও কালেই কথিত ভাষা ছিল না, চিরকালই ইহা "schrift-sprache"—পণ্ডিতে কাগজ কলমে লিখিতেন। Prof. Rapson প্রমুখ আচার্য্যেরা এ মত খণ্ডন করেছেন। দুপক্ষে এখনও তুমুল তর্ক চল্‌ছে—নিশ্চিন্ত হয়ে কোনও মতটাকেই এখনও অবলম্বন করা যায় না। কেবল ইহাই ঠিক বলা যেতে পারে যে এরূপ দুর্ব্বল ভিত্তির উপর আমাদের বাংলার উন্নতির সৌধ স্থাপন কর্‌লে চল্‌বে না। যে ভাষা কখনও চল্‌তি ছিল কিনা তারই সন্দেহ, যদি তার নিয়মে একটা জীবন্ত ভাষাকে চালাবার চেষ্টা করা যায়, তাহা হ'লে আমাদের ইতিহাসের শিক্ষার বিরুদ্ধে চল্‌তে হবে এবং শেষে পস্‌তাতে হবে।

ভাষাকেই এক সময় না এক সময় এই সমস্যার উত্তর সকল ঠিক করে নিতে হয়েছে। আধুনিক জার্ম্মাণ ভাষার ইতিহাসই তার সাক্ষ্য দিচ্ছে। প্রুশিয়ার অধীশ্বর Frederick the Greatকে আধুনিক জার্ম্মাণী সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা বল্‌লেই চলে। কিন্তু তিনি বরাবরই ফরাসী ভাষায় কবিতা লিখিতেন। তাঁর সময়ে ফরাসী আদব ভাষাতে চলিত। সাহিত্যে ত চলিতই, অধিকন্তু শব্দেতেও

তার আধিপত্য কম ছিল না। এ সময়কার জার্ম্মাণ সাহিত্যকে ভাঙ্গা ফরাসী বলিলেই চলে। সেই সময়ে Leipzigএ কয়েকটী লেখকের আবির্ভাব হয়। গট্‌শেড তারই অন্যতম। তিনি ভাষা থেকে ফরাসী প্রভাব দূর করতে সম্যক চেষ্টা করেন। একটা সভা স্থাপনা করে সকল ব্যবহৃত শব্দগুলির আভিজাত্য নিরূপণ করা হয়। ঠিক হয় যে, জার্ম্মাণ ভাষাতে যে Latin, French ও বিদেশী শব্দ আছে, তার জায়গায় জার্ম্মাণ শব্দ গঠন করা হ'বে, আর যে ভাবটী লাটিন শব্দ ও জার্ম্মাণ শব্দ দ্বারা সমান রকমেই প্রকাশ করা যায়, সেখানে জার্ম্মাণ শব্দটিকে গ্রহণ করতে হবে। এই সব নিয়মের আধুনিক ফল জার্ম্মাণ সাহিত্যে বেশ দেখা যায়। অনেকে লাটিন ও ফরাসী শব্দ আদৌ ব্যবহার করেন না। গট্‌শেডের পর লেসিং গট্‌শেডের নিয়মগুলি সাহিত্যে জেদ করে ব্যবহার করেছিলেন। তার পর এঁদের গঠিত সাহিত্য, শিলার ও গেটের হাতে ভুবন-বিখ্যাত হ'য়েছে। কিন্তু গেটে ও শিলারের ভাষাও এখন অনেকটা বদ্‌লেছে। হাইনার ও নিয়েট্‌জার ভাষার সঙ্গে গেটে ও শিলারের ভাষার প্রচুর প্রভেদ। মধ্যে মধ্যে বহুরূপ পণ্ডিত সভা স্থাপিত হ'য়ে জার্ম্মাণ সাহিত্যকে নিয়মে বাঁধবার চেষ্টা করা হ'য়েছে, কিন্তু কোনটাই চিরস্থায়ী প্রভাব বিস্তার করতে পারে নি।

ইংরাজী সাহিত্যের উদাহরণই দেখা যাক্। যখন বেউল্‌ফ ও লেয়ামন লিখিয়াছিলেন, তখন কোন dialect ইংরাজী বলে গণ্য হবে, সে সমস্যার অনেকেই উত্তর দিতে পারেন নাই। এ সম্বন্ধে Earleএর Philologyর গোড়ার কয়েক পৃষ্ঠাতেই বেশ সুচারু-রূপে আলোচনা আছে। তার পর Chaucer; তাঁর ভাষা আবার অন্যরূপ। Spenser, Shakespeare ও Milton যদিও প্রায় সমসাময়িক, ভাষার ভঙ্গীতে কিন্তু কত প্রভেদ। আবার এই ইংরাজীই Rudyard Kipling কিম্বা Maesfield ব্যবহার করেন তাঁদেরই সঙ্গেই বা Pope ও Drydenএর ভাষার মিল কই? আজ-কালকার অনেক ইংরাজী-

শিক্ষিত বাঙ্গালী Shakespeare, Johnson ও Burkeএর ইংরাজী ব্যবহার করেন বলে আমাদের Jabberjee বলে কত না ঠাট্টা করা হয়। কই আপনি Macaulay কিম্বা Carlyleএর styleএ লিখে পার পান দেখি ?

কথাটা হ'চ্ছে এই, যে ভাষাবিজ্ঞানেই—Philologyতেই বলুন বা সাহিত্যেই—Literatureএতেই বলুন, কোন খানেতেই এক বাঁধা নিয়ম চিরকাল খাট্‌বে না।. যখন যেটার সাহায্যে ভাষা ও সাহিত্যের উন্নতি হবে, প্রতিভাশালী লেখক তখনই তাহার সাহায্যে অগ্রসর হবেন। যেখানে একটা চল্‌তি কথায় ভাবটা ঠিক প্রকাশ করা যায়, সেখানে ঘুরিয়ে সংকৃত শব্দ ব্যবহার কর্‌তে কেহই রাজী হবেন না। এটা মানসিক শৈথিল্যের জন্য নয়, ভাবের স্ফূর্ত্তির জন্য। ভাষার গঙ্গা দেশ-দেশান্তর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে; অনেক নূতন শাখানদী অনেক নূতন সম্পদ্ এনে যোগ দিচ্ছে—পর্ব্বত-বন্ধুর হিমাচল ক্রোড় থেকে শস্য-শ্যামলা বঙ্গদেশ পর্য্যন্ত, বিভিন্ন রূপে একই নদী দ্বারা পুষ্ট হচ্ছে। কেহই পদ্মাতে অলকানন্দার অনাবিল স্বচ্ছতা খোঁজে না।

তবে কি লেখকদের উচ্ছৃঙ্খলতার কোনও বাধা নাই ? ক্রিয়াপদ আগে দিয়ে আর সর্ব্বনাম পদ বাক্যের শেষে দিয়ে কি লেখাটাই এদেশে চলে যাবে ? আর কলিকাতার "হালুম হুলুম" কি বাঙ্গালা ভাষাতে চির কালই ভয় দেখাতে থাক্‌বে ? খাইলাম লিখি, না "খেলুম" লিখি—না সব পরিত্যাগ ক'রে "ভক্ষণ করিলাম" লিখিব ? শ্রীহট্টের ভাষাই কি বাঙ্গালার আদর্শ হবে, না নবদ্বীপের ভাষাটাকেই আমাদের সকলকেই মেনে চল্‌তে হবে ?

কোন্ প্রাদেশিক ভাষা শেষে বাঙ্গালা ভাষার আদর্শ হবে তা বলা সুকঠিন। যদি কোনও ভাষা আদর্শ হয়, তাহা হ'লেও এই আদর্শ ভাষা যে চিরকালের জন্য বাঙ্গালা ভাষাটাকে একটা বিশেষ ছাঁচে বদ্ধ ক'রে রাখ্‌বে, এরূপ ভাববারও কোন কারণ দেখি না। আলালী

ভাষা, বিদ্যাসাগরী ভাষা, বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষা বা রবীন্দ্রনাথের ভাষা, সব ভাষাগুলিরই বিশেষত্ব আছে। এই সব লেখকদের হাতে তাঁদের ভাষার ভঙ্গী বেশ পরিপুষ্টি লাভ করেছে। ভবিষ্যতে যদি শ্রীহট্ট কিম্বা কুচবিহার হইতে প্রতিভাশালী লেখকের উদ্ভব হয় এবং তিনি তাঁর প্রাদেশিক ভাষাতে লেখেন তা' সকলেই আহ্লাদের সহিত পড়্বে এবং তিনি বঙ্কিমচন্দ্রকে কিম্বা রবীন্দ্রনাথকে অনুসরণ করেন নাই বলে কেউ তাঁর দোষ ধর্‌বে না। যে রকম ভাষাতেই প্রতিভা-শালী কবি লিখুন না কেন, জন-সমাজকে তাহা গ্রাহ্য কর্‌তে হবে—কেন না 'নিরঙ্কুশা হি কবয়ঃ'। ভাষাতে লোকে প্রাণ খোঁজে, পোষাক নহে। যৌবনের উদ্দামশক্তির যে বিকাশ হয়, তাহা জীবনীশক্তির পরিচায়ক এবং ভাষাতেও সেই শক্তির বিকাশ আমরা জীবনীশক্তির প্রমাণ বলে আদর কর্‌ব।

শ্রীমন্মথনাথ বসু।

চির-কিশোর

শৈশবে শিখিনু আমি কন্দুকের ক্রীড়া
তব পাশে ধূলি মাখা সাজে,
তোমার চরণ বেড়ি নাচিয়া নাচিয়া
এই বিশ্ব-বৃন্দাবন—মাঝে।

কৈশোরে তোমার সহ বনে, পথে, মাঠে
গোঠে গোঠে চরাইনু ধেনু,
যমুনার কাল জলে খেলিনু সাঁতার
শিখিলাম বাজাইতে বেণু।

যৌবনে যা' রসলীলা প্রেমের স্বপন
সেও তব প্রেম-দৌত্য কাজ,
তব দোল-ঝুলনের করি আয়োজন
রচিলাম তব প্রেম-সাজ।

আজি বৃদ্ধ-গোপ আমি হে চির-কিশোর
তুমি একই করিতেছ লীলা,
আমি শুধু ভাব-মগ্ন কাঁদি, ঝরঝর
গলে যায় হৃদয়ের শিলা।

আজো তুমি বাজাইছ সুমোহন বেণু
অনন্তের বারতা সে আনে,
বিশ্বভরা তব দোল-ঝুলন হেরিয়া
নাচিবারে সাধ যায় প্রাণে।

শ্রীকালিদাস রায়।

পৌরাণিকী কথা

ধরার ভার ও অবতার

পুরাণ সকল ভাল করিয়া পড়িলে মনে হয়, জর্ম্মণ দেশের আধুনিক দার্শনিকগণ যে Super-man বা অতি-মানুষের কল্পনা করিয়াছেন, তাহাই আমাদের অবতার। অতিমানুষ-প্রভাবসম্পন্ন যিনি, যিনি সমাজের গ্লানি দূর করিয়া, সমাজে সামঞ্জস্য প্রতিষ্ঠা করিতে পারেন, ধরার ভার হরণ করিতে পারেন, তিনিই অবতার, তিনিই Super-man। সামঞ্জস্যের নাশকেই ভার বলা যায়; শক্তিসামঞ্জস্যকে যে বাহিরের শক্তি নষ্ট করিতে পারে, সেই বিরোধী শক্তির সাহায্যেই ভারের অনুভূতি হয়। সেই শক্তিই ভারের দ্যোতক। এই শক্তিই অধর্ম্ম; ইহার অভ্যুত্থান হইলেই ধরার ভার বাড়িয়া যায়, আর নারায়ণকে অবতাররূপে অবতীর্ণ হইতে হয়। জর্ম্মণ দার্শনিকগণের State, আমাদের সমাজ এবং পুরাণের ধরা প্রায় একই পদার্থ। যাহার দ্বারা State বা সমাজ বা ধরা স্থির থাকে, সমঞ্জসীকৃত মানবশক্তির প্রভাবে উন্নতি ও বিকাশের পথে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে পারে, তাহাই ধরার বা সমাজের বা Stateএর ধর্ম্ম; কেন না তাহার দ্বারাই সমাজ ধৃত রহিয়াছে। সমাজের ধারণাশক্তিই সমাজের ধর্ম্ম, ধরার ধর্ম্ম, Stateএর ধর্ম্ম। এই ধর্ম্মের গ্লানি হইলেই নারায়ণের অবতার—Super-manএর আবির্ভাব প্রয়োজন হইয়া পড়ে। অবতার পাপ-পুণ্যের গণ্ডীর ভিতর থাকেন না; তিনি তেজস্বী, তিনি যাহা করেন, তাহাই পুণ্য, তাহাই তাঁহার লীলা। বালিবধের কথা তুলিয়া আচার্য্যগণ বলিয়াছেন, তোমার-আমার পাপ পুণ্যের মাপকাটি লইয়া শ্রীরামচন্দ্রের কার্য্যের বিচার কর কোন্ হিসাবে? তিনি ধর্ম্মের গ্লানি দূর করিবার জন্য, দুষ্কৃতের বিনাশের জন্য অবতীর্ণ হইয়াছিলেন; বালি দুষ্কৃত, ধর্ম্মের অপহ্নবকারী; যেমন করিয়া হউক তিনি তাহার

বধ সাধন করিয়া সমাজের কল্যাণের পথ উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছেন। বালিবধে যখন সমাজের কল্যাণ হইয়াছে, তখন বধের ভঙ্গী লইয়া বিচার করার কোন প্রয়োজন দেখি না। আচার্য্যগণের ও ব্যাখ্যাতা-গণের এই বিচারপদ্ধতি, এবং জর্ম্মণ দার্শনিকগণের Super-man প্রতিষ্ঠার বিচার পদ্ধতি মিলাইয়া দেখিলে একটু বিস্মিত হইতে হয়; কেন না, সিদ্ধান্ত বাক্যে উভয়েই প্রায় এক স্থানে গিয়া পঁহুছিয়াছেন।

অবতার তত্ত্বের মধ্যে, ধরার ভার হরণ-ব্যাপারে ব্যক্তিত্ব—মান-বতা যেন অপরিহার্য্য ব্যাপার। ইচ্ছাময় ভগবান্ ইচ্ছা করিলে অঘটন ঘটে, ধরার সকল ভার হরণ হইয়া যায়; তিনি মানুষ সাজিয়া জগতে অবতীর্ণ হনই বা কেন, মানবতার সকল দুঃখ বহনই বা করেন কেন? ইহার উত্তরে Schleirmacher শ্লিয়রম্যাকরের একটা উক্তি উদ্ধৃত করিব—"The State alone gives the individual the highest degree of life"। সমাজে না থাকিলে মানবতার উন্মেষ, আদর্শ মনুষ্যের সৃষ্টি হইতেই পারে না। ভগবান অবতার গ্রহণ করেন আদর্শের সৃষ্টির জন্য; সে আদর্শ কাহাদের জন্য? মানুষের মঙ্গলের জন্য। মানুষের মঙ্গল সাধন হয় কিসে? বাধা-উত্তীর্ণে, দুঃখ-উপভোগে। তাই যুগে যুগে অবতার গ্রহণ করিয়া ভগবান কেবল দুঃখের বোঝাই বহিয়া গিয়াছেন। আমাদের পুরাণ কেবল দুঃখের কাহিনীতেই ভরা—দুঃখের ইতিহাস, ট্র্যাজেডির পরম্পরায় পরিপূর্ণ। কারণ, গ্লানি মানেই দুঃখ, ধরার ভার বোধ হই-তেছে বলিলেই ধরা-বক্ষে দুঃখের উৎপত্তি হইয়াছে, বুঝিতে হইবে। সে দুঃখের অনুভূতি যাহার নাই, সে তেমন দুঃখ দূর করিতে পারে না। ভগবান অবতার গ্রহণ করিয়া প্রথমে দুঃখের স্বাদ গ্রহণ করেন, পরে সেই দুঃখের ক্রোড়ে মানুষ হইয়া, পূর্ণরূপে দুঃখের পরিচয় পাইয়া তবে তাঁহাতে অতিমানুষ-মহত্ত্বের উন্মেষ হয়; সেই মহত্ত্বের প্রভাবে তিনি দুঃখ দূর করেন, ধরার ভার হরণ করেন। তাই তিনি যে সমজে ধর্ম্মের গ্লানি উপস্থিত হইয়াছে, সেই সমাজেই জন্মগ্রহণ

করেন, যে সংসার হইতে দুঃখের উৎস ছুটিয়া বাহির হইয়াছে, সেই সংসারেই অধিকাংশ স্থলে অবতীর্ণ হন। পরশুরাম মাতৃ-কলঙ্কের বোঝা মাথায় করিয়া তীব্র জ্বালায় অধীর হইয়া, একুশ বার ধরাধামকে নিঃক্ষত্রিয় করিয়াছিলেন; শ্রীরামচন্দ্র পিতার কলঙ্ক-দুঃখের ভার বহন করিয়াছিলেন; শ্রীকৃষ্ণ ও বলরাম মাতুলের কলঙ্কে দুঃখী; বুদ্ধদেব প্রজার দুঃখে দুঃখী; কল্কী দুঃখের প্রবাহে দুঃখী। বলির মত দাতা, জ্ঞানী, পণ্ডিত-সেবক সম্রাট্‌কে সমাজপতির কর্ত্তব্য বুঝাইতে যাইয়া ভগবান দুঃখে ন্যুব্জ ক্ষুদ্রকায় বামন হইয়া অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। অবতার তত্ত্বের বিশ্লেষণ করিলে বুঝা যায় যে, দুঃখ ছাড়া অবতার হয় নাই—হইতেই পারে না।

এইখানে ভাবুকগণ একটি প্রশ্ন করিয়াছেন—সত্য যুগে চারি পাদ ধর্ম্ম, অথচ চারিটি অবতার; ত্রেতায় তিন পাদ ধর্ম্ম, অথচ তিনটি অবতার; দ্বাপরে দুই পাদ ধর্ম্ম, অথচ দুইটি অবতার; কলিতে এক পাদ ধর্ম্ম, অথচ একটি অবতার? যখন ধর্ম্মের আধিক্য থাকিবে তখন অবতারের বাহুল্য কেন? উত্তরে আচার্য্যগণ বলিতেছেন যে, ধর্ম্মের আধিক্য থাকিলেই ধর্ম্মের গ্লানির অনুভূতি সদ্যঃ সদ্যঃ হয়। মনুষ্য-সমাজে ধর্ম্মের গ্লানির অনুভূতি হইলেই দুঃখের উৎপত্তি হয়। দুঃখ হইতেই ধরার ভারবোধ, এবং সেই জন্যই নারায়ণের অবতার গ্রহণ। সত্য যুগে চতুষ্পাদ ধর্ম্মের প্রাবল্য ছিল বলিয়াই ধর্ম্মের গ্লানির অনুভূতি তীব্রভাবে হইত, কাজেই ডাকের মাথায় ভগবানকে আসিতে হইত। কলিযুগে ধর্ম্মাধর্ম্মের অনুভূতি ক্ষীণ; ধর্ম্মের গ্লানি হইল কি না হইল তাহাই সামাজিকগণ সহজে বুঝিতে পারেন না; গ্লানিবোধ না থাকিলে দুঃখ বোধ হয় না। দুঃখ বোধ না হইলে দুঃখ দূরের চেষ্টা হয় না। সমাজে দুঃখ দূরের চেষ্টা না হইলে নারায়ণের অবতার হয় না। পরন্তু, যখন দুঃখের সাগরে মনুষ্য-সমাজ ভাসিয়া উঠে, তখন নৈসর্গিক নিয়মানুসারে, দেবতার আহ্বানে নহে, নারায়ণকে দুঃখ দূর করিবার জন্য নাশের অবতার সাজিয়া কেবল একবার

আসিতে হয়। এই জন্য কলিতে একটি বৈ দুইটি অবতার নাই।

আবার ইহার মধ্যে আরও একটু মজা আছে। যে কয়টি কেবল নাশের অবতার, কেবল্ ধরার ভার হরণ করিয়া চলিয়া যান, সে কয়টি জাতিতে ব্রাহ্মণ; যাঁহারা নাশও করেন, রক্ষাও করেন, তাঁহারা ক্ষত্রিয়। নৃসিংহ, বামন, পরশুরাম, কল্কী—ইহাঁরা চারি জন ব্রাহ্মণ। দেবতার মধ্যে সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা এবং সংহারকর্ত্তা শিব, উভয়েই ব্রাহ্মণ। একা পালনকর্ত্তা নারায়ণই ক্ষত্রিয়। নারায়ণ স্বয়ং ক্ষত্রিয়; কিন্তু তাঁহার দশাবতারের মধ্যে কাহারও মতে পাঁচজন, কাহারও মতে চারিজন ব্রাহ্মণ। যখনই সমাজে পালনী শক্তির অপচয় ঘটিয়াছে বা সে শক্তির ব্যাঘাতকারী আর কিছুর উদ্ভব হইয়াছে, তখনই ব্রাহ্মণরূপে ভগবান অবতীর্ণ হইয়া হয় অপচয়ের উপচয় ঘটাইয়াছেন, নহে ত ব্যাঘাতকে দূর করিয়াছেন। হিরণ্যকশিপু ভাল রাজা ছিলেন, কিন্তু বৈষ্ণবী শক্তির বিরোধী ছিলেন; সে বিরোধের ব্যথা ফুটাইবার জন্য প্রহ্লাদের জন্ম; প্রহ্লাদের আহ্বান প্রভাবেই নৃসিংহ অবতার এবং ব্যাঘাতের অপসারণ। বলির দানে, একটা গুণের অত্যন্ত বৃদ্ধিতে সমাজের সামঞ্জস্য নাশ এবং দানের স্পর্দ্ধাবিকাশ, তাই ব্রাহ্মণ বামনের অবতার গ্রহণ। ক্ষাত্র শক্তির উন্মাদ-বিকাশে বিলাসের উদ্ভব, ব্রাহ্মণ্যের অপচয়, তাই জামদগ্ন্যের অবতরণ। কলির প্রভাবে পাপের অতিবৃদ্ধি—অত্যন্ত বিস্তার, তাই বিষ্ণুযশার গৃহে ব্রাহ্মণ কল্কীর জন্মগ্রহণ। পরশুরাম ক্ষাত্র শক্তিকে প্রায় নির্ম্মূল করিয়াছিলেন বলিয়াই বেদব্যাস ব্রাহ্মণরূপে সে শক্তির উপচয় সাধন করিয়াছিলেন। পুরাণের সর্ব্বত্রই ব্রাহ্মণ্য শক্তি সৃষ্টিতে ও নাশে প্রযুক্ত, ক্ষাত্র শক্তি রক্ষায় ও পালনে নিযুক্ত। তন্ত্রে আদ্যাশক্তির বেলায়ও ঐরূপ জাতিবিচার আছে। যেখানে মা জগদ্ধাত্রী, সেখানে মা নারায়ণী—বৈষ্ণবী শক্তি সম্পন্ন। যেখানে মা সংহারকারিণী, সেখানে তিনি ব্রাহ্মণী শিবাণী। শ্রীমদ্ভাগবতের মতানুসারে শ্রীভগবানের

অসংখ্য অবতার হইলেও, সৃষ্টি স্থিতি বিনাশ গুণ অনুসারে তাঁহাদের জাতি নির্ণয় হইয়াছে।

পুরাণের অবতারবাদের আলোচনা করিলে বুঝা যায় যে, চাই একটা মানুষ। মধ্যে মধ্যে, যুগে যুগে একটা আদর্শ-মনুষ্যের উদ্ভব না হইলে সমাজ ঠিক থাকে না, ধর্ম্ম ঠিক থাকে না, মানুষের মতি কল্যাণপ্রদ পন্থায় পরিচালিত হয় না। সে মনুষ্য কিসের আদর্শ দেখাইবে? বর্ণহার্ডীর কথায় উত্তরটা দিব—"Man can only develop his highest capacities when he takes his part in a community, in a social organism, for which he lives and works"। এই সঙ্গে Treischke ত্রিৎসাকের কথাটা তুলিব—The State is a moral community. It is called upon to educate the human race by positive achievement, and its ultimate object is that a nation should develop in it and through it into a real character"। এই জন্য চাই একটা মানুষ। সে মানুষ positive achievement বা কর্ম্মের দ্বারা সমাজের আদর্শ স্থির করিয়া দিবেন। তিনি সমাজের একটা character বা বিশিষ্টতা, তিনিই অবতার, তিনিই Super-man। বৈদিক সাহিত্যে আর পৌরাণিক সাহিত্যে পার্থক্য এই যে, বেদে ও উপনিষদে কর্ম্মীর কর্ম্ম-শৃঙ্খলার উন্মেষ নাই, পুরাণে তাহাই আছে। মানুষ কেমন করিয়া কর্ম্ম করিলে কেমন আদর্শের উন্মেষ ঘটাইতে পারে তাহা পুরাণেতিহাস বর্ণনা করিয়াছেন। ব্যক্তিত্বের, Individualismএর বিকাশের জন্যই পুরাণের মাহাত্ম্য। আর সেই ব্যক্তিত্ব অবতারবাদেই পরিস্ফুট। ব্যক্তিত্ব কেবল একটা মানুষের বৈশিষ্ট্য-জ্ঞাপক নহে, উহা State, উহা জাতির বিশিষ্টতার দ্যোতক। শ্রীরামচন্দ্রের ব্যক্তিত্ব, জাতির বিশিষ্টতার সহিত জড়ান—মাখান, তাই তিনি সীতাকে বনবাসিনী করিয়াছিলেন। তাঁহার ব্যক্তিগত বা পরিবারগত সুখ ত সুখ নহে, তিনি যে রাজা—

State, তাই জাতির পরিবাদের দৃষ্টিতে দেখিয়া সীতাকে বর্জ্জন করিয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ কেবল বাসুদেব নহেন, ভারতের শ্রীকৃষ্ণ; তাই তিনি কুরুক্ষেত্রের মহা-রণ-প্রাঙ্গণে পার্থসারথি, যদুবংশ-ধ্বংসের সময়ে নির্ব্বিকার। তাঁহার বংশ থাকিলেই কি, না থাকিলেই বা কি! চাই জাতির পুষ্টি, বিস্তৃতি এবং বিশিষ্টতার রক্ষা। যাহাতে সে কর্ম্ম সুসম্পন্ন হয়, তাহা তিনি অম্লান-মুখে করিয়াছিলেন। তাই শ্রীকৃষ্ণ পূর্ণাবতার—পূর্ণব্রহ্মস্বরূপ। পুরাণে এই ব্যক্তিত্বের, এই অতিমানুষ প্রভাবের বর্ণনা দেখিয়া পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ উহাতে বৌদ্ধ-ধর্ম্মের প্রভাব দেখিতে পান। পুরাণ সকল বৌদ্ধযুগের পরে রচিত বলিয়া তাঁহাদের বিশ্বাস। কেন না, তাঁহারা বলেন, বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রচলনের পর হইতে ব্যক্তিত্বের Super-manএর পরিকল্পনা ভারতবর্ষের ধর্ম্মে ও সাহিত্যে হইয়াছে। তাহার পূর্ব্বে বৈদিক কর্ম্মকাণ্ডের ধর্ম্ম communal বা বংশানুক্রমিক ছিল। অবতারের বা অতি-মানুষের কর্ম্মের আদর্শে বেদ পরিচালিত হইত না; ধর্ম্মকর্ম্মের সাবয়ব, মানব আদর্শ বেদেও ছিল না। বৌদ্ধ-ধর্ম্মের পর জগতে যত ধর্ম্মের উদ্ভব হইয়াছে, সকল ধর্ম্মেই একটা Super-man, একটা অবতারের সৃষ্টি হইয়াছে। ইহা ছাড়া তাঁহারা ইহাও বলেন যে, জন্মান্তরবাদ না মানিলে অবতারবাদ মানা যায় না। খাঁটি বৈদিক সাহিত্যে জন্মান্তরবাদ নাই। বৌদ্ধধর্ম্মের প্রচলনকাল হইতেই জন্মান্তরবাদ ভারতে, তথা জগতের সাহিত্যে প্রবেশ লাভ করিয়াছে। সুতরাং এই Super-man, এই অবতারবাদের কল্পনা বৌদ্ধযুগের পর হইয়াছে। সে যাহাহউক, পুরাণ মানুষ দেখাইয়াছে, মানুষের কর্ম্মের ও আদর্শের উন্মেষ-পদ্ধতিও দেখাইয়াছে। অবতারবাদ সেই মানবতা প্রদর্শনের আকারান্তর মাত্র; ধরার ভারের মাধুরী-মণ্ডিত আখ্যায়িকা এবং State ও Humanityর ধর্ম্মের গ্লানির জন্য দুঃখের উপাখ্যান মাত্র।

অবতার লইয়া পুরাণে অনেক রকমের মতবাদ আছে। শৈব ও বৈষ্ণব মতবাদ এক রকমের নহে। শৈব পুরাণগুলিতে প্রধা-

নতঃ ব্রাহ্মণের মাহাত্ম্যই বর্ণিত; বৈষ্ণব পুরাণে কেবল ক্ষত্রিয়ের উপাখ্যানই অধিক। নৃসিংহ, বামন, জামদাগ্ন্য, এবং কল্কীর পূজার কথা বৈষ্ণব পুরাণে কোথায়ও পাইবে না; যদি থাকে ত তাহা সংক্ষেপে অবান্তর কথার হিসাবে বলা হইয়াছে। মহারাষ্ট্রদেশে নৃসিংহ ও পরশুরামের মন্দির দেখিয়াছি; উত্তর ভারতে কুত্রাপি দেখি নাই; তবে কাশীধাম নাকি সকল দেবতার আশ্রয় স্থান, কাশীতে খুঁজিলে ব্রাহ্মণ দেবতার ও অবতারের মন্দির পাওয়া যায়। বৈষ্ণব পুরাণে যে সকল রাজা বা সম্রাটকে ধর্ম্মের গ্লানিকর বলিয়া পরিচিত করা হইয়াছে তাহারা সবাই শৈব অথবা শাক্ত। বৈষ্ণবদ্বেষী বলিয়াই তাহারা রাক্ষস, দানব, দৈত্য বা অসুর। হিরণ্যাক্ষ, হিরণ্যকশিপু, রাবণ, কংস প্রভৃতি সবাই শৈব বা শাক্ত। শৈব পুরাণ সকলে ইহার পাল্টা জবাবও পাওয়া যায়। ইহা ছাড়া জৈন-প্রভাবও পুরাণে স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। পুরাণ এবং উপপুরাণগুলি মন্থন করিয়া বিচার করিলে হিন্দু জাতির ধর্ম্ম-বিপ্লব সকলের ইতিহাসটা সংগ্রহ করা যাইতে পারে। বৌদ্ধের প্রভাবও পুরাণে কম নাই; অবলোকিতেশ্বর শিবকে বলা হইয়াছে, বিষ্ণুকেও বলা হইয়াছে। যাউক, সে কাজটা যোগ্যতর ব্যক্তির দ্বারা পরে সুসম্পন্ন হইতে পারে। এখন আমি অবতার সম্বন্ধে দুই তিনটা মতবাদের আলোচনা করিয়া আমার বক্তব্য শেষ করিব।

প্রথমে শিবপুরাণের এবং ঐ সঙ্গে তন্ত্রের মতবাদটার উল্লেখ করিব। জলে যেমন কাটি দিয়া নাড়িলে জলে ফেনা বাঁধিয়া উঠে, তেমনি বিশ্বব্যাপী আত্মশক্তির সাগরে ব্যথিত জীব আত্মার ইচ্ছার—বাসনার দণ্ড দিয়া ঘন-ঘন মন্থন করিলে বিশ্বব্যাপী আত্মা হইতে ফেনের মতন একটি বিভূতির সৃষ্টি হয়। সেই বিভূতি দেহী হইয়া সমাজে প্রকট হইলেই অবতারের উদ্ভব হয়। ব্যথিতের কামনা যখন যেমন ভাবে পরিস্ফুট হয়, তখন সেইভাবের কামী হইয়া বিশ্বব্যাপী আত্মার উদ্ভব হয়। বিশ্বব্যাপী আত্মা স্বেচ্ছায় রূপধারণ করেন না, মানুষের ইচ্ছা তাঁহাকে

যেরূপে ও যেভাবে নামাইতে চাহে, তিনি সেইভাবে ও সেইরূপে প্রকট হইয়া থাকেন। কোন একটা মনুষ্য-সমাজের আলোড়নেই যে অবতার হয়, তাহা নহে, একজন সাধক একনিষ্ঠ হইয়া কামনা করিলে তাহার কামনা পূর্ণ হয়। এইহেতু ভগবানের—পরমাত্মার অবতার অনন্ত, অসংখ্য। কেবল সমাজের গ্লানি দূর করিবার জন্যই তিনি অবতার হন না, ব্যক্তিবিশেষের দুঃখ দূর করিবার জন্যও তিনি ধরাধামে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন। প্রহ্লাদের দুঃখ দূর করিবার জন্যই নৃসিংহ অবতার। তন্ত্র এই সঙ্গে ইহাও বলেন যে, যখন মনুষ্যমাত্রেই আত্মার অংশ, মনুষ্যের ইষ্টদেবতা যখন আত্মস্বরূপিণী, যখন ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত সিদ্ধান্ত যে, যত জীব, তত শিব,—শিবের ধ্যান করিতে হইলে নিজের মাথায় ফুল দিয়া নিজের আত্মধ্যান চিত্ত ও বুদ্ধির সাহায্যে করিতে হয়, তখন প্রত্যেক সাধকই এক একটি অবতার। যে সিদ্ধ, যাহার আত্মদর্শন হইয়াছে, সে প্রকট অবতার; যে অসিদ্ধ, দেহাত্মবুদ্ধিসম্পন্ন, সে সম্মূঢ় অবতার, তাহার আত্মার অবতৃত্ব-শক্তি তাহাতে সম্পুটিত হইয়া আছে। এই সিদ্ধান্ত অনুসারে কেবল নারায়ণেরই অবতার হইবার কথা নহে, যত শক্তি, যত দেবতা আছে, সকলেরই অবতার আছে। নারদের ভক্তিশাস্ত্রে লিখিত আছে যে, মানুষের মনে একাদশটি আসক্তি আছে, সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণ অনুসারে উহার তেত্রিশটা বিকাশ আছে; প্রত্যেক বিকাশের এক কোটি করিয়া আলম্বন আছে। অতএব আসক্তি-অনুকূল কামনার প্রেরণায় প্রকট অবতার বা দেবতার সংখ্যা তেত্রিশ কোটি। শৈব ও তান্ত্রিকদিগের এই সিদ্ধান্তটা বৈষ্ণবগণ একেবারে অস্বীকার করিতে পারেন নাই; তাই শ্রীমদ্ভাগবত স্পষ্ট বলিয়াছেন যে অবতারের সংখ্যার নির্দ্দেশ করা যায় না; এবং সকল পক্ষ বজায় রাখিবার উদ্দেশ্যেই যেন ভাগবতকার বাইশটা অবতার স্বীকার করিয়াছেন। গীতায় বিভূতিবাদের অধ্যায়ে শ্রীভগবান এই মতটার সহিত যেন কতকটা আপোষ করিয়াছেন বলিয়া মনে হয়।

আনন্দগিরি স্বীয় টীকায় কথাটা একেবারে যেন খুলিয়া বলিয়া দিয়াছেন।

বৈষ্ণব মত দ্বৈতবাদের মত। বৈষ্ণব, ভগবানের একটা স্বতন্ত্র অস্তিত্ব এবং জীবের একটা স্বতন্ত্র অস্তিত্ব স্বীকার করেন। রামানুজাচার্য্য বলিয়াছেন যে, জীবও নিত্য, নারায়ণও নিত্য। জীবের আকাঙ্ক্ষা এবং অধিকার অভিব্যক্ত নারায়ণের সেবায়—কৈঙ্কর্য্যে; নারায়ণ অনাদিকাল হইতে জীবের সেবা খাইতেছেন, অনাদিকাল পর্য্যন্ত সেবা খাইতে থাকিবেন। সৃষ্টি ও স্রষ্টা নিত্য ভিন্ন, কখনও এক হইবে না, কখনও এক হইবার নহে। যখন জীবের মধ্যে পাপের বৃদ্ধি হয়, জীব যখন নারায়ণের কৈঙ্কর্য্য ভুলিয়া যায়, তখনই নারায়ণ স্বেচ্ছায় অবতাররূপে ধরাধামে অবতীর্ণ হন। দশবার তাঁহাকে ধরাধামে নররূপে অবতীর্ণ হইতে হইয়াছিল। মৎস্য, কূর্ম্ম, বরাহ ও নৃসিংহ এই চারি অবতারে নরত্বের অভিব্যঞ্জনা আছে। তাই আচার্য্য উহাদিগকে মানুষ বলিয়াই ধরিয়া লইয়াছেন। পুরাণ পড়িলে বুঝা যায় যে, উহারা মানুষ ছাড়া অন্য জন্তু ছিল না। গল্পের রং চড়াইবার হিসাবেই যেন উহাদের কেহ মাছ, কেহ কচ্ছপ, কেহ শূকর, কেহ বা আধা মানুষ আধা সিংহ ভাবেই প্রকট হইয়াছিলেন। কেবল হিরণ্যকশিপুর হিংসার জন্যই নর বা বিষ্ণু সিংহরূপ ধারণ করিয়াছিলেন। সিংহ শব্দ হিংসা হইতেই উৎপন্ন, নর বা নৃ বিষ্ণুর নামান্তর মাত্র। বৈষ্ণবী শক্তির বিকাশ দেখাইবার জন্যই তিনি নর বা বিষ্ণু, কেবল হিংসা করিবার জন্যই উদ্ভূত বলিয়া তিনি সিংহ। এই ভাবে আচার্য্য মৎস্য, কূর্ম্ম, বরাহ এই তিন অবতারের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। বৈষ্ণব বলেন, ভগবান ভাব বিলাইবার জন্যই ধরাধামে অবতীর্ণ হন; তাঁহার দশটি ভাব দশ অবস্থায় জগৎকে বুঝাইয়া শেষে সকল ভাবের ভাবী, সকল রসের রসিক, মাধুরীর অবতার পূর্ণব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ রূপে তিনি জগৎকে ঐশিক মহিমা বুঝাইয়া গিয়াছেন। "কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্"—এই বলিয়া অনেক বৈষ্ণবে শ্রীকৃষ্ণকে অবতার বলিয়া মানেন না। শৈব, তান্ত্রিক এবং

বৈষ্ণব, অবতার-তত্ত্বের এই তিনটা মত লইয়াই পুরাণের অনেক আখ্যায়িকা এবং উপাখ্যান রচিত। তন্ত্র বলেন, পৃথিবী কেবল মাটির ঢিবী নহে, পৃথিবীর আত্মা আছে, অনুভূতি আছে, শ্বাস-প্রশ্বাসের ক্রিয়া আছে, পরমায়ুঃ আছে। তন্ত্রের আত্মার সর্ব্বব্যাপিত্বটুকু গল্পের ছলে বুঝাইবার উদ্দেশ্যে পুরাণ ধরাকে মানবী করিয়া রচিয়াছেন। ধরার ব্যথা বা বেদনাটা পুরাণের ভাষায় ধরার ভারে পরিণত হইয়াছে।

গীতায় অবতারবাদের সকল মতের সার সঙ্কলন করিয়া দেওয়া হইয়াছে। গীতা যেন আমাদের সিদ্ধান্ত-শাস্ত্রের বৈষ্ণবী compendium এ কথাটা আচার্য্যগণ স্বীকার করিয়াছেন। বচন আছে—

"সর্ব্বোপনিষদো গাবো
দোগ্ধা গোপালনন্দনঃ।
পার্থো বৎসঃ সুধীর্ভোক্তা
পানং গীতামৃতং মহৎ॥"

অর্থাৎ সকল উপনিষদ্ যেন গরু; শ্রীকৃষ্ণ গোয়ালার ছেলে, দুগ্ধ দুইতে পারেন ভাল, তাই তিনি উপনিষদ্ গাভীকে দোহন করিতেছেন; অর্জ্জুন হইলেন বাছুর, তিনি একটা জিজ্ঞাসার ঢুঁ মারিতেছেন আর দুধ বাহির হইতেছে। যাহারা সুধী তাহারাই এই গীতামৃতরূপী দুগ্ধ পান করিতেছেন। কাজেই বলিতে হয় যে, কর্ত্তারাও গীতাকে সঙ্কলন-গ্রন্থ বলিয়া স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু এই compendium বৈষ্ণবের তৈয়ারী, এ কথাটা রামানুজ স্পষ্ট করিয়া বলিয়া গিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, শাঙ্কর মতের মাপকাটিতে গীতাকে মাপিলে গীতা প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধমতের গ্রন্থ হইয়া দাঁড়ায়। গীতার ব্যাখ্যা বৈষ্ণব মতানুসারে করিতে হইবে, তবে গীতা বুঝা যাইবে। কথাটা যে একেবারেই ভিত্তিহীন, তাহা বলিতে পারি না। শাঙ্কর মতানুসারে গীতার সকল কথার, সকল সিদ্ধান্তের সামঞ্জস্য হয় না। যাউক সে কথা, গীতার অবতার-তত্ত্বের পাল্টা জবাব চণ্ডীতে আছে। চণ্ডীতে মায়ের আবি-

র্ভাবের ব্যাপারটা, সকল মতের সমন্বয় সাধন করিয়া যেন ঘটান হইয়াছে। ফেন যেমন বুদ্‌বুদের সমাহারে জন্মায়, জগদম্বা তেমনি শুম্ভ নিশুম্ভ বধে সকল দৈবীশক্তির সমাহারে ফুটিয়া উঠিয়াছিলেন। মহিষাসুর, মধুকৈটভ, শুম্ভনিশুম্ভ, প্রত্যেক অসুরের বধে মায়ের এক একটা নূতন বিকাশ; সে বিকাশ যেন শৈব বা শক্তি অবতারতত্ত্বের নানা সিদ্ধান্তের এক একটি সাবয়ব প্রতিমা। গীতা ও চণ্ডী পাশাপাশি রাখিয়া পড়িতে পারিলেই অবতারবাদের ধরার ভারের তত্ত্বের অনেক লুকান কথা ফুটাইয়া তোলা যায়। বলিয়াছি ত পুরাণ—কান্তাবাণী; বৈদিকী এবং তান্ত্রিকী উপনিষদ্ সকলের Theory গুলিকে উদ্ভট গল্পাকারে পরিণত করিয়া তত্ত্বকথা শিখানই পুরাণের উদ্দেশ্য। বৈদিক উপনিষদের মধ্যে কয়েকখানির পঠনপাঠন আমাদের দেশে প্রচলিত আছে; তান্ত্রিক সকল উপনিষদ্ লোপ পাইয়াছিল। বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতির উদ্‌যোগে শ্রীযুত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় কয়েকখানি তান্ত্রিক উপনিষদের সংগ্রহ করিয়াছেন। সেগুলি ছাপা হইলে এবং আমাদের বোধগম্য হইলে অনেক পুরাণের অনেক উৎকট কথা সোজা হইতে পারে। আপাততঃ পুরাণ পাঠ করিয়া আমি আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধি অনুসারে যাহা সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি, অবসরমত পাঠকগণকে তাহাই উপঢৌকন দিতেছি। আমি নিজের মত বা নিজের সিদ্ধান্ত কিছুই বলি নাই, সে পরে বলিলেও বলিতে পারি। এখন কেবল সারসংগ্রহ করিয়া ডালা সাজাইতেছি। কথায় কথায় authority দেখাই নাই; কেহ সত্যসত্যই অনুসন্ধিৎসু হইলে তাঁহাকে হদিস্ বলিয়া দিতে পারি।

শ্রীপাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়।

৩। নির্ব্বাণ কয় রকম ?

থেরাবাদী বুদ্ধেরা ও প্রত্যেক বুদ্ধেরা মনে করিতেন, মানুষ যদি সদুপদেশ পাইয়া, অথবা, নিজে মনে মনে গড়িয়া লইয়া চারিটি আর্য্য-সত্যে বিশ্বাস করে, আট রকম নিয়ম মানিয়া চলে, তাহা হইলে বহু-কাল অভ্যাসের পর, তাহারা স্রোতে পড়িয়া যায়। এইরূপ যাহারা স্রোতে পড়িয়া যায়, তাহাদের সোতাপন্ন বলে। স্রোতে পড়িলে যেমন সে আর উজান যাইতে পারে না, ভাটিয়াই যায়, সেইরূপ সোতাপন্ন নির্ব্বাণের দিকেই যাইতে থাকেন, সংসারের দিকে তিনি আর কখন ফিরিয়া আসেন না। তাঁহার পুনঃ পুনঃ জন্ম হইলেও তিনি আর উজান বহেন না।

সোতাপন্ন আরও কিছুদিন নিয়ম পালন করিলে, তিনি "সকৃদা-গামী" হয়েন, অর্থাৎ তিনি আর একবার মাত্র জন্ম গ্রহণ করেন। বুদ্ধদেব এই 'সকৃদাগামী' অবস্থাতেই তুষিতভবনে বাস করিতেছিলেন। তিনি আর একবার মাত্র পৃথিবীতে আসিলেন ও নির্ব্বাণ পাইয়া গেলেন।

সকৃদাগামী আরও কিছুদিন নিয়ম পালন করিলে, তিনি যে অব-স্থায় আসিয়া দাঁড়ান, তাহাকে "অনাগামী" অবস্থা বলে। এ অব-স্থায় আসিলে আর ফিরিতে হয় না। ইহার পরের অবস্থার নাম অর্হৎ। অর্হৎ যদিও কিছুদিন বাঁচিয়া থাকেন, তবুও তিনি মুক্ত পুরুষ। তিনি যে নির্ব্বাণ পাইয়া থাকেন, তাহার নাম "স্বউপাদি সেস নিব্বাণ" বা স্ব উপাধি শেষ নিব্বাণ। ইহা নির্ব্বাণ তাহাতে সন্দেহ নাই, কিন্তু ইহাতে পুনর্জ্জন্মের কিছু কিছু "উপাদান" এখনও শেষ আছে; অথবা সকল কর্ম্ম এখনও ক্ষয় হয় নাই। আরও

সূক্ষ্ম করিয়া বলিতে গেলে—কর্ম্ম হইতে যে সংস্কার জন্মে, তাহার কিছু কিছু এখনও রহিয়া গিয়াছে।

এইরূপ জীবন্মুক্ত অবস্থায় অর্হৎ কিছুদিন থাকিলে, তাঁহার কর্ম্মের ক্ষয়ই হয়, সঞ্চয় আর হয় না। ক্রমে সব কর্ম্ম ক্ষয় হইয়া গেলে তাঁহার মৃত্যুর সময় উপস্থিত হয়। মৃত্যু হইলেই তিনি "নিরুপাদি সেস নির্ব্বাণ ধাতু"তে প্রবেশ করেন—অর্থাৎ তখন তাঁহার কর্ম্মও থাকে না, কর্ম্ম হইতে উৎপন্ন সংস্কারও থাকে না। তিনি নির্ব্বাণে প্রবেশ করেন, সব ফুরাইয়া যায়।

মহাযানীরা বলেন 'এই যে হীন-যানীদের নির্ব্বাণ, ইহা নীরস, নিষ্ঠুর, স্বার্থপর, এবং ইহাতে অতি সঙ্কীর্ণ মনের পরিচয় দেয়। হীন-যানীরা ও প্রত্যেক যানীরা জগতের জন্য একেবারে 'কেয়ার' করেন না। তাঁহাদের কাছে জগৎ থাকা না থাকা দুইই সমান। নির্ব্বাণ পাইয়াও তাঁহারা কাঠের বা পাথরের মত হইয়া যান। ও নির্ব্বাণ, যাহারা বুদ্ধিমান, যাহাদের শরীরে দয়ামায়া আছে, যাহাদের হৃদয় আছে, যাহারা শুধু আপনার সুখের জন্য বাস করে না, যাহারা পরের জন্য ভাবিতে শিখিয়াছে, তাহাদের কিছুতেই ভাল লাগিবে না। তাহারা নির্ব্বাণের অন্যরূপ অর্থ করিয়া লইবে।

মহাযানীরা মনে করেন যে, নির্ব্বাণকে নিষেধমুখে অর্থাৎ 'না' 'না' করিয়া দেখিলে চলিবে না। উহাকে বিধিমুখে অর্থাৎ 'হাঁ'র দিক্ হইতেই দেখিতে হইবে। আত্মার নাশের নাম নির্ব্বাণ, জ্ঞানের নাশের নাম নির্ব্বাণ, বুদ্ধির নাশের নাম নির্ব্বাণ,—এই যে হীনযানীরা 'না'র দিক্ হইতে উহাকে দেখিয়া থাকেন, উহা বুদ্ধের মনের কথা হইতে পারে না। তিনি 'চতুরার্য্যসত্য' ও আর্য্য অষ্টাঙ্গ মার্গ উপদেশ দিয়া গিয়াছেন। তাঁহার মতে আর্য্য অষ্টাঙ্গ মার্গ বা আটটি সুপথ ধরিয়া চলার নামই নির্ব্বাণ। তাঁহার মতে মনুষ্য হৃদয়ের যত আশা আকাঙ্ক্ষা, সব শান্তি করিয়া দেওয়ার নাম নির্ব্বাণ নহে; সেই সকল আশা আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ হইতে দেওয়ার নামই নির্ব্বাণ। কিন্তু সে

আশা বা আকাঙ্ক্ষায় লিপ্ত থাকিলে চলিবে না, তাহার ঊর্দ্ধে অবস্থিতি করিতে হইবে।

দেখান গেল যে, মহাযান নির্ব্বাণ 'না'র দিক্ হইতে নয়, 'হাঁ'র দিক্ হইতে বুঝিতে হইবে। নিরালম্ব নির্ব্বাণে বোধিচিত্ত যে কেবল ক্লেশপরম্পরা হইতে মুক্ত হন, এরূপ নয়, কুদৃষ্টি হইতেও মুক্ত হন। তখন বোধিচিত্ত ধর্ম্মকায়ের পবিত্র মূর্ত্তি দেখিতে পাইবেন। দুটি জিনিস তখন তাঁহাকে পথ দেখাইয়া লইয়া যাইবে—(১) সর্ব্বভূতে করুণা, (২) ও সর্ব্বব্যাপী জ্ঞান। যিনি এইরূপে 'সম্যক্ সবোধি' লাভ করিয়াছেন, তিনি সংসারের উপরে উঠিয়াছেন, নির্ব্বাণেও তখন তাঁহার একান্ত আস্থা নাই। তখন তাঁহার উদ্দেশ্য হইয়াছে সর্ব্বজীবের পরিত্রাণ ও তাহার জন্য তিনি আপনাকে বারংবার বদ্ধ করিতেও কাতর হন না। তাঁহার সর্ব্বব্যাপী-প্রজ্ঞাবলে তিনি পদার্থের সত্যাসত্য দেখিতে পান। তাঁহার জীবন তখন উৎসাহে পরিপূর্ণ, উহা সম্পূর্ণরূপে কর্ম্মময় হইয়া গিয়াছে। কারণ, তাঁহার হৃদয় তাঁহাকে বলিতেছে, 'সমস্ত প্রাণীকে মুক্ত কর ও চরমানন্দে ভাসাইয়া দাও।' তিনি নির্ব্বাণেও তৃপ্তি লাভ করেন না, নির্ব্বাণেও তিনি বসতি করিতে পারেন না, তাঁহার কি ভব, কি নির্ব্বাণ কোনই আলম্বন নাই, এইজন্য তাঁহার নির্ব্বাণের নাম নিরালম্ব নির্ব্বাণ।

মহাযানীদের আর একরকম মুক্তি আছে। এ মুক্তি ভব ও নির্ব্বাণের অতীত। ইহা সম্পূর্ণরূপে ধর্ম্মকায়ের সহিত এক। আমরা যাহাকে তত্ত্ব বলি, সাধারণ লোকে যাহাকে তথ্য বলে, মহাযানীরা তাহাকে তথতা বলে। ধর্ম্মের যে তথতা তাহার নাম ধর্ম্মকায়। যিনি মুক্তি লাভ করিয়াছেন, তিথি তথাগত হইয়াছেন, অর্থাৎ পরমসত্যে আগত হইয়াছেন।

সে পরম সত্যটি কি? জগতে আমরা যাহা কিছু দেখিতে পাই, তাহার তলায় যে নিগূঢ় সত্যটুকু রহিয়াছে, তাহারই নাম ধর্ম্মকায়। ধর্ম্মকায় হইতেই নানাবিধ বিচিত্র সৃষ্টি সম্ভব হইয়াছে। ইহা হইতেই

সৃষ্টিতত্ত্ব বুঝা যায়। ধর্ম্মকায় মহাযানীদের নিজস্ব, কারণ হীনযানীরা জগতের আদিকারণ নির্ণয় করিতেই যান নাই। তাঁহাদের মতে ধর্ম্মকায় বলিতে বুদ্ধের ধর্ম্ম ও তাঁহার শরীর বুঝাইত। অনেকে মনে করেন, ধর্ম্মকায় বলিতে বেদান্তের পরমাত্মা বুঝায়, কিন্তু সে কথা সত্য নয়। নিগুর্ণ পরমাত্মা অস্তিত্ব মাত্র। ধর্ম্মকায়ের ইচ্ছা আছে, বিবেকশক্তি আছে, অর্থাৎ, ইঁহার করুণা আছে ও বোধি আছে। সকল সজীব পদার্থই এই ধর্ম্মকায়ের প্রকাশমাত্র।

নির্ব্বাণ বলিতে চৈতন্যের নাশ বুঝায় না, চিন্তার নিরোধও বুঝায় না। নির্ব্বাণে নিরোধ করে কি? কেবল অহংভাবেরই ইহাতে নিরোধ করে। ইহাতে বলিয়া দেয় যে অহং বলিয়া যে, একটা পদার্থ কল্পনা করা হয়, তাহা অলীক ও এই অলীক কল্পনা হইতে আরও যত ভাব উঠে, সে সবও অলীক। এতটুকু ত গেল কেবল 'নিষেধমুখে' অর্থাৎ 'না'র দিক্ হইতে। বিধিমুখে অর্থাৎ 'হাঁ'র দিক্ হইতেও ইহার একটা অর্থ আছে। সেটি করুণা—সর্ব্বভূতে দয়া। এই দুইটা জিনিস লইয়াই নির্ব্বাণ সম্পূর্ণ হয়। হৃদয় যখন অহংভাব হইতে মুক্ত হইল, অমনি, যে হৃদয় এতক্ষণ সঙ্কীর্ণ ও অলস ছিল, তাহা আনন্দে উৎফুল্ল হইল, নূতন জীবনের ভাব দেখাইতে লাগিল, যেন কারাগার ছাড়িয়া বন্দী বাহির হইয়া পড়িল। এখন সমস্ত জগৎই তাহার, এবং সেও সমস্ত জগতেরই। সুতরাং একটি প্রাণীও যতক্ষণ নির্ব্বাণ পাইতে বাকি থাকিবে, ততক্ষণ তাঁহার নির্ব্বাণ পাইয়া লাভ কি? নিজের জন্যই হউক বা পরের জন্যই হউক, সমস্ত জগৎ তাঁহাকে উদ্ধার করিতেই হইবে।

একজন বোধিসত্ত্ব বলিতেছেন, "অবিদ্যা হইতে বাসনার উৎপত্তি এবং সেই বাসনা হইতে আমার পীড়ার উৎপত্তি। সমস্ত সজীব পদার্থ পীড়িত সুতরাং আমিও পীড়িত। যখন সমস্ত সজীব পদার্থ আরোগ্য লাভ করিবে, তখন আমিও আরোগ্য লাভ করিব। কিসের জন্য? বোধিসত্ত্ব জন্ম ও মৃত্যু যন্ত্রণা স্বীকার করেন? কেবল জীবের জন্য।

জন্ম ও মৃত্যু থাকিলেই পীড়া থাকে। যখন জীবের পীড়ার উপশম হয়, বোধিসত্ত্ব রোগযন্ত্রণা হইতে মুক্ত হন। যখন পিতামাতার একমাত্র সন্তান পীড়িত হয়, তখন পিতামাতারও পীড়া উপস্থিত হয়। সে সন্তান নীরোগ হইলে পিতামাতাও নীরোগ হন। বোধিসত্ত্বেরও ঠিক সেইরূপ। তিনি সমস্ত জীবগণকে সন্তানের মত ভালবাসেন। তাহারা পীড়িত হইলেই তিনি পীড়িত হন, তাঁহারা নীরোগ হইলেই তিনি নীরোগ হন। তুমি কি শুনিতে চাও কেন বোধিসত্ত্ব এরূপ পীড়িত হন? তিনি মহাকরুণায় আচ্ছন্ন, তাই তিনি পীড়িত হন।"

শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী।

দান

সে আমারে কত রূপে দেছে প্রেম উপহার!
সতত পারশে আছে ধরিয়া বিবিধাকার।
প্রথমেতে সে পার্ব্বতী স্নেহরূপা মূর্ত্তিমতী;
পুরুষ-প্রকৃতি ভেদে,—জনক জনমাধার।—
সে আমারে কত রূপে দি'ছে প্রেম উপহার!
কভু সে পরাণ-সখী; মরমে মরমে রাখি,—
জাহ্নবী-যমুনা যেন মুক্ত-বেণী—পূতধার।
কভু সে অনুজ সাথী; ক্রীড়া-রসে মাতামাতি—
কায়া সাথে ছায়া যেন একই রূপে একাকার
সে আমারে কত রূপে দেছে প্রেম উপহার!
যৌবনে, দ্বিতীয় অঙ্কে, তুলে সে লইয়া অঙ্কে—
বঁধুয়া মধুর হেসে ঢেলে দেছে প্রেমধার!
পুনঃ সে তনুজ সখা, স্নেহ ভক্তি মধু মাখা;
আলম্বন যষ্টি শেষ স্থবির জীবনাধার—
সে আমারে কত রূপে দেছে প্রেম উপহার!
আমার আঁখির আগে কত রূপে বঁধু জাগে;
নয়নে নয়নে হাসি—দিনে—পলে শতবার!
পিয়ার আনন মম শতদল নিরুপম;—
ঢুল-ঢুল চারু সরে—কোথায় তুলনা তার!
সে হাসি হৃদয়ে আঁকা, সে হাসি সুরভি মাখা,
সে হাসি সোহাগে ভরা, সে হাসি হাসির সার!
সতত সমুখে আছে ধরিয়া বিবিধাকার;
কতরূপে সে আমারে দেছে প্রেম উপহার!

শ্রীমতী গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী।

মাঝে থাকা

"দরশন লাগি বর নাহি মাগি"

আমি ? সাগর-সৈকতে আমি একটি বালুকণা মাত্র। বালুকণা বলিয়া এ সাগরের কুল কিনারার সন্ধান রাখিনা, আদি-অন্তের সীমা জানিনা, ভূত-ভবিষ্যতের জ্ঞান নাই, শুধু মধ্যে থাকাই আমার ধর্ম্ম, বর্ত্তমানের প্রকাশই আমার জীবন।

এ সৈকতে আমার ন্যায় বালুকণা অগণিত। কিন্তু তাহাদের সহিত আমার প্রভেদ আছে। তাহারা সাগরের জোয়ার ভাটার খেলার সামগ্রী—স্তূপীকৃত হ'য়ে পড়ে আছে। সেই জোয়ার ভাটার টানেই তাহাদের অনুভূতি, সুখদুঃখ, উৎসাহ ও অবসাদ, আলো ও আঁধার, ভাসিয়া উঠা ও ডুবিয়া যাওয়া। যদিও তাহাদের প্রত্যেকেরই একটি স্বধর্ম্ম আছে, তথাপি তাহাদের স্বার্থ বিশ্বরাজার অর্থের অধীনে, তাহাদের স্বধর্ম্ম বিশ্বরাজার বিশ্বধর্ম্মে চাপা পড়িয়া গিয়াছে। তাহাদের জঠরে ক্ষুধা আছে, তালুতে পিপাসা আছে, জীবনে সংগ্রাম আছে, জ্ঞানে অসঙ্গতি আছে, কিন্তু সে ক্ষুধার, সে পিপাসার, নিবৃত্তি আছে, —সে সংগ্রামের শাসন আছে, মীমাংসা আছে,—সে জ্ঞানের চরমে সঙ্গতি আছে। "আমি তোমারই অঙ্গ-বিশেষ, অন্তিমে আমি তোমাতেই সঙ্গত হইব" এই চিরসঙ্গম আশায় শান্ত হইয়া তাহারা প্রাণিধর্ম্ম ও সংসারধর্ম্ম, সমাজধর্ম্ম ও বিশ্বধর্ম্ম, রক্ষা করিয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করে। তাহারা হইল বিশ্বরাজ্যের প্রজা, রাজার ধর্ম্মে রাজ্যের এলাকায় সুখে স্বার্থে প্রতিপালিত ও বর্দ্ধিত হওয়াই তাহাদের অধিকার। আমার কিন্তু তাহা নয়। আমি একটি বিদ্রোহী প্রজা। আমি স্বতন্ত্র রাজ্য সৃষ্টি করিতে চাই, হোক্ না কেন সে বালুকণার রাজ্য। বিশ্বধর্ম্মে আমি স্বধর্ম্ম খোয়াইব না, বিশ্বের মূল্যে বিকাইব না।

এতদিন কে যেন আমাকে ডুবাইয়া রাখিয়াছিল। কিন্তু আ[illegible] পুনরায় মাথা তুলিতে শিখিয়াছি। ডুবি নাই, আর ডুবিব না। [illegible] সাগর হইতে উঠিয়াছি, সে সাগরে ডুবিব না। ধীবরেরা জাল পাতি[illegible] অতল জলধি হইতে শুক্তিকা তুলে, আর দৈবক্রমে যদি কোন মুক্ত[illegible] জাল কাটিয়া ধীবরের হাত এড়াইতে পারে, তবে—তবে সে পুনরা[illegible] সমুদ্রগর্ভে পতিত হয়! আমি কিন্তু অতল জলধি-গর্ভে প্রাণ হারাই না। ঊর্ণনাভ সযত্নে জাল বুনিয়া আমাকে তাঁহার ফাঁদে বন্দী করিয়াছি[illegible]লেন, আমি কিন্তু সে মায়াবীর জাল কাটিয়া ভাসিয়া উঠিয়াছি। আমি প্রাণ হারাইতে পারি না, ডুবিলেও নিজগুণে স্বধর্ম্ম-প্রভাবে শোলার ন্যায় ভাসিয়া উঠি। সাগরে মুক্তাবাহী নটিলাসের (Nautilusএর ন্যায় সন্তরণ করিতে করিতে কোথায় ভাসিয়া যাই।

এ লঘুত্ব কি যৌবনের ধর্ম্ম? বার্দ্ধক্যে কি গুরুত্ব মিলে? ওজনে ভারি হইতে শেখা যায়? না, প্রাণের বয়স নাই, জরা নাই। বিশ্বের বশ্যতাই তাহার জড়তার, স্থবিরত্বের, মূল। মহত্তের অধীনতা-স্বীকার, ভূমার আশ্রয় লাভই, ক্ষুদ্রের প্রকৃত শৃঙ্খল।

চুম্বকের আকর্ষণে লৌহখণ্ড চুম্বকের দিকে ধাবিত হয়, এবং পরিণামে চুম্বকের সহিত সংলগ্ন হয়। পরশমণির সংস্পর্শে বালুকণাও স্বর্ণে পরিণত হয়। মাধ্যাকর্ষণের টানে পার্থিব বস্তুমাত্রই মৃত্তিকার উপর পতিত হয়। আমার সম্বন্ধে কিন্তু তাহা খাটিবে না। পরের মূল্যে নিজেকে বিকাইব না। পরশমণির সংস্পর্শে সোণা হইতে চাহি না। ক্ষুদ্র বালুকণা হইয়া থাকিব সেও ভাল, তবু যেন পৃথিবীতে পরিণত হইয়া পৃথিবীর বৃহদাকার প্রাপ্ত না হই। বেলাভূমিতে এক পার্শ্বে পড়িয়া থাকিব। বালুকণা জ্বলে, পুড়ে, কিন্তু ভস্মসাৎ হইয়া মাটিতে মিশাইতে জানে না।

বালুকণার কথা বলিতে বলিতে কি বলিয়া ফেলিলাম। বালুকণা হইয়া একপার্শ্বে থাকিতে পারি কৈ? আমি একরত্তি বালুকণা, কিন্তু বালুকণা হইয়া অভ্রের গুণ পাইয়াছি। আমি স্বচ্ছ হইয়াছি। আমি

লিয়া উঠিলে যে বিশ্বের ছায়া আসিয়া আমার উপর প্রতিবিম্বিত য়। আর সেই প্রতিবিম্বে আমার প্রাণের আগুন দ্বিগুণ হইয়া জ্বলিয়া উঠে। এই আবছায়া, অৰ্দ্ধছায়া, খণ্ড আকৃতি দেখিয়া কিন্তু প্রাণে তৃপ্তি আসে না। ক্ষুদ্র বালুকণা হইয়া সমগ্রের প্রতিবিম্বও ধারণ করিতে পারি না। তাই রস-ভঙ্গ করাই আমার ব্যবসা! প্রাণের মায়া আছে বলিয়া পতঙ্গের ন্যায় অনলে ঝাঁপ দিয়া ছাই হইতে চাহি না।

পুড়িয়া মরা হইল না। তবে করি কি? আমি মাঝে থাকিতে চাই। কাছাকাছি, পাশাপাশি, মাটি ও আকাশের মাঝামাঝি। হায়! বালুকণা না হইয়া পাখী হইলাম না কেন? কবিত্বের ডানা মিলিলে ঐ আকাশের কাছে কাছে উড়িয়া গান গাহিয়া গাহিয়া জীবন কাটাইয়া দিতাম। মাটিতে আর নামিতাম না। বালুকণার আবাস বেলাভূমিতে। আকাশে ও বেলাভূমিতে যে অনেক খানি ব্যবধান। ঐ উপরের আকাশ ছেড়ে এত দূরে থাকিতে মন সরে না। আবার আকাশে, শূন্যে, মিলাইয়া যাইতেও পারি না। মাঝে থাকিতে চাই। আকাশের কাছাকাছি, পাশাপাশি, মাটি ও আকাশের মাঝামাঝি। পাখী হইলাম না কেন? উড়িতে শিখিলাম না কেন? দুটা ডানা থাকিলে আকাশের কাছে কাছে উড়িয়া সুখ পাইতাম।

অথবা ভ্রমর হইতে পারিলে মন্দ হইত না। ভ্রমর ফুলে ফুলে মধুপান করে। কানন ও মধুচক্রের মধ্যে যে পথ আছে সেইখানেই সে বিচরণ করে, আর তৃষিত প্রাণের পিপাসা নিবারণ হইলে মধুচক্র নির্ম্মাণ করিতে বসিয়া যায়। ইহাই স্বভাবের নিয়ম। সে পরের পীযূষ শোষণ করিয়া নিজের ভাণ্ডার পূর্ণ করে। কিন্তু এই মধুমক্ষিকাবৃত্তি আমাকে রাখিতে পারিল কই? আমার আজ বনপথে বিচরণ শেষ হয়েছে। আজ আমার রসকর্ম্ম নাই, কিন্তু এই রসের ভাণ্ডার লইয়া করি কি? এই রসই আমার বালাই। ফেলিতেও পারি না, পান করিতেও পারি না। এ যে নিজের রস।

তাই অপরকে মধুদান করিবার নিমিত্ত এই রসের বোঝা মাথায় লইয়া বেড়াইতেছি। হায়! জীবের ভাগ্যে স্বতন্ত্রতা কোথায়? বলিতে চাই, না না,—কে যেন বলায়, হাঁ হাঁ। স্কন্ধে যুগভার, মাথা নাড়িয়া ফল কি? এই বাহকবৃত্তিই কি তবে আমার কর্ম্ম? ইহাও কি দাসত্ব নহে? হউক, তথাপি দাস্যবৃত্তি করিতে করিতে কোনও প্রভুর হাতে মর্য্যাদা নষ্ট করিব না। প্রভুর মর্য্যাদা আছে, দাসীর কি মর্য্যাদা নাই? রসের বোঝা বহন করিতে করিতে যেন সুধারসে স্বরসে একরসে গলিয়া না যাই। সোহাগিনী আদরিনী হইব না। কেবল আড়ালে থাকিয়া দূরে সরিয়া সরিয়া দাস্যবৃত্তিই শ্রেয় মনে করি।

যখন রস বহন করাই আমার ধর্ম্ম তখন নিজেকে দাস না বলিয়া বাহন বলি। বুঝিলাম এ ত নিজ রস নয়, কোন দেবতার সুধামস্তার বহন করিতেছি। আমি দেবতার বাহন। দেবতা যখন ভক্তের নিকট আসিয়া উপস্থিত হন, তখন বাহনের ও প্রয়োজন আছে।

আমি কেবল দেবতার বাহন নই, আমি আবার ভক্তের ও সোপান। আমি আজ স্বর্গ ও মর্ত্ত্যের আনাগোনার পথ। কিন্তু পথ শুধু বাঞ্ছিতের সঙ্গমে লইয়া যায়। পথের জন্য সে সঙ্গম নহে।

এতাবৎকাল দুই লইয়া আলোচনা করিয়া আসিলাম। কিন্তু আজ দেখিতেছি তিনেরও যে আবশ্যক আছে, নতুবা আমার স্থান কোথায়? ভক্ত ভগবান, সাধ্য সাধনা, কর্ম্ম কর্ত্তা, জ্ঞাতা জ্ঞেয়, লক্ষ্য উপলক্ষ্য, —লইয়া আর কতকাল ঘুরিব। সাধনার সোপানে সাধ্যের অনুগামী হইয়া এতাবৎকাল ছুটিয়া আসিলাম, কিন্তু যতই উঠি, যতই অগ্রসর হই, ততই সাধ্য দূর হইতে দূরতর হইয়া পড়ে। প্রাণে আবার আকুলতা আসে, আবার অবসাদ, আবার মোহ।

তাই এবার সোপান হইয়া মধ্যে থাকাই স্থির করিয়াছি।—তাহাতে কোন বালাই নাই। সাধ্যের পথের পথিকেরা, সোপানে আরোহণ করিয়া লক্ষ্যের উদ্দেশে যাত্রা করুণ। সোপান শুধু বুক

পাতিয়া তোমাদের দেহভার বহন করিবে। এই পাষাণ রূপ ধারণ করিয়া মানবের বাহন হইয়া ধন্য হইব। পাষাণী অহল্যা ভবিষ্য অবতারের প্রতীক্ষা করিয়াছিলেন। আমি কাহারও পদরেণু-স্পর্শে মুক্ত হইবার আশা রাখি কি?

স্বেচ্ছায় অবমাননার ভার বহন করাই আজ আমার মাথার মণি। আজ সকলকার ধূলা, সকলকার বোঝা, মস্তকে লইয়া স্বেচ্ছায় আপনার মান খোয়াইয়া পড়িয়া আছি। একদিন যে আমি তাঁহারই পিয়ার ছিলাম। সেদিন ভগবানের সাকীর পানপাত্র বহিবার প্রয়োজন ছিল। আজ আর সাকী হইতে চাহি না। আমি আজ সেই ভাঙ্গা পেয়ালা, তাঁহার পানের শেষে মাটিতে গড়াগড়ি যাই-তেছি। সংসার আমাকে পদদলিত করিয়া উল্লাস করুক। আর আমি স্বপদভ্রষ্ট হইয়া সেই আনন্দে সহায়তা করি। তবে আজ এই স্বপদচ্যুতি, স্বধর্ম্মের নাশই, আমার ধর্ম্ম হউক।

না, না, কি বলিতে বলিতে কি বলিয়া ফেলিলাম। পাষাণে আবার উত্তাপ কেন? বিক্ষোভ কেন? শীতল, অসাড়, না হইলে সোপান হইব কেমনে?—

আমি মাঝে থাকিতে চাই। মর্ত্ত্যে মধ্যবর্ত্তীরও প্রয়োজন আছে। মধ্যবর্ত্তীর ভিতর দিয়াই সকল প্রকাশ, সকল পূরণ, সকল মিলন। তাই সূর্য্যের কিরণধারা যেন কোন্ দৌত্যচর্য্যায় সাগরবক্ষ হইতে বাষ্প উত্তোলন করিয়া পৃথিবীর উত্তপ্ত বক্ষ শীতল করে। পীযূষ-ভারাবনত স্তনের ভিতর দিয়া শিশু মাতৃবক্ষ হইতে শোণিত শোষণ করিয়া কলায় কলায় বর্দ্ধিত হয়। ভাষার অভিব্যক্তিতেই ভাব বুদ্ধিতে প্রকাশিত হয়। অনাহত ওঙ্কার রূপেই ব্রহ্ম প্রতিপ্রাণে শব্দপ্রমাণ হইয়া অবস্থান করেন। ছায়াময়ী কায়া দেখিয়াই বিশ্বরূপের অস্তিত্বের নিদর্শন পাইয়া থাকি।

কেবল বহির্জগতে বা অন্তর্জগতে নয়—উভয়ের সঙ্গমক্ষেত্র ঐতিহা-সিক জগতেও এই মধ্যবর্ত্তীরই অভিনয় দেখিতেছি। ভগবান ও

মানবসন্তান (Son of Man, Universal Humanity) থাকিলেও লীলার জন্য পারিষদেরও উপযোগিতা আছে। অবতারী নারায়ণ ও বিরাট জীবসমষ্টি থাকিলেও যুগাবতারের প্রয়োজন আছে। তাই ইতিহাস এক মহাপুরাণ, যুগাবতারকাহিনী, নর-নারায়ণের কথা।

শুধু তাই নয়। জীব চৈতন্যের অস্তিত্বই এই মাঝে থাকায়। ব্রহ্ম ও বিশ্বরূপ আছেন, কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে চৈতন্যের জাগরণও প্রার্থিত। সেইরূপ জীবাত্মা ও পরমাত্মার মধ্যে মনেরও প্রাধান্য আছে, নতুবা এ দ্বয়ের উপলব্ধি করিবে কে? সঙ্গমস্থল কোথায়?

সেই নিমিত্তই বুঝি খৃষ্টীয় ধর্ম্মে তিনের উল্লেখ আছে। পিতা, পুত্র, পবিত্র-আত্মা। তাই পুত্র যীশুখৃষ্ট মধ্যবর্ত্তীরূপে মানবসন্তানের উদ্ধারের নিমিত্ত আনাগোনা করিবেন। আর তাই বুঝি শ্রীকৃষ্ণের অবতার চৈতন্যদেব ঘাটে ঘাটে মাথা রাখিয়া পাপীতাপীদিগকে 'আয় 'আয়'! বলিয়া ডাকিয়াছিলেন। আজও কি বিশ্বমানব ধর্ম্মসংস্থাপক খৃষ্টের আগমনের প্রতীক্ষায় পথ চাহিয়া বসিয়া নাই? আজও কি ভক্তগণ হৃদয়ে মহাপ্রভুর সেই "আয় আয়" ধ্বনি শ্রবণ করিতেছেন না? নতুবা ভক্ত বৈষ্ণব কবি গাহিবেন কেন, "গৌরাঙ্গ আমার, নাচত আবার"।

কে তুমি, মাঝে আসিয়া যুগে যুগে মর্ত্ত্যবাসীকে ডাকিতেছ! একদিন আমি সেই ডাক শুনিয়াছিলাম। আজ আমিই তোমার ডাক। আমি তোমার হাতে মুরলী। মুরলী কিন্তু নিজে বধির। মুরলীর জন্য সে ডাক নহে!

কে তুমি? হৃদয়ে হৃদয়ে তোমার মুরলী বাজাইয়া বাজাইয়া প্রত্যেককে আকুল করিতেছ; সেই আহ্বান শুনিয়া কতজনে আপন কুটীর ছাড়িয়া সমাজ ও সংস্কারের রুদ্ধ প্রাচীর ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া কোন্ অজানা পথে ছুটিতেছে, যেন বন্যার স্রোতে ভাসিয়া চলিয়াছে। সেই স্রোতের টানে কেহ উঠিতেছে, কেহ পড়িতেছে, কেহ ভাসিতেছে, কেহ ডুবিতেছে। কোন কোন মাঝি আপন ক্ষুদ্র তর-

নীটি ঘাটেও বাঁধিতে পারিয়াছে, আবার কেহ কেহ অকূলের সন্ধানও পাইয়াছে।

কে ডাকে ঐ, আবার আবার, "আয় আয়"! "আয় আয়"! ঐ কি মায়াবিনী ডাকিনী (Siren) সাইরেন-এর গান, যাহা শুনিলে সংসারের মায়াবন্ধন সকলই টুটিয়া যায়, অবশেষে কোন অজ্ঞাত সাগরসৈকতে দেহের জীর্ণ কঙ্কাল শুকাইতে থাকে! কে গায় ঐ! কি গায় ঐ! ঐ কি নিয়তির তান?

এ জগতে ডাকার শেষ হইল না। চাওয়ারও শেষ হইল না। কিন্তু ডাকে কে? চায় কে! তুমি না আমি!

আজ আর কেহ ডাকে না। হৃদয়-গহনে সেই চিরপরিচিত মুরলীধ্বনি বাজে না। আজ যেন কোন গভীর নীরবতা, চিরস্তব্ধতা, মহাশূন্যের ন্যায় আমাকে বেষ্টন করিয়া আছে। আপনি মরিয়া আমাকে ডাকিয়া তুমি পলাইয়াছিলে, আমি তোমার দিকে ধাইয়া তোমাকে পাইয়াছিলাম; কিন্তু পরের জন্য, তোমার জন্য—শ্রীরাধিকা যেমন গোপিনীদিগের জন্য রাসলীলা পরিত্যাগ করিয়াছিলেন,—আমিও সেইরূপ তোমাকে ছাড়িয়া আসিয়াছি, আমাকে পাইলে যে তুমি আর কাহাকেও চাহ না! তাই আজ আমি পলাতক, তোমায় অস্বীকার করি, দূরে সরিয়া দাঁড়াই!

"দরশন লাগি বর নাহি মাগি!"

কিন্তু কৈ যাহাদের জন্য আসিলাম, যাহাদের জন্য কলঙ্কের ডালি মাথায় করিলাম, তাহারা ত আমাকে গ্রহণ করিল না! তোমার সঙ্গ-দোষ যে আমার অঙ্গে অঙ্গে লাগিয়া গিয়াছে তাই আর আমাকে কেহ চিনে না, কেহ ডাকে না, কেহ চায় না। তুমি আমার উপর মান করিয়া নীরব হইয়া রহিলে, আর অপরে আমাকে ঘৃণা করিয়া বর্জ্জন করিল; তাই একুল ওকুল দুকুল হারাইয়া মাঝে পড়িয়া গেলাম।

"দরশন লাগি বর নাহি মাগি!"

হে আমার নীরব প্রভু! তুমি আজ গোপনে, অন্তরতলে, নীরব

হইয়া থাক। আজ আর আপনাকে প্রকাশ করিতে গিয়া আপনাকে সীমাবদ্ধ করিও না। আপনার নিষ্ফলতা নাশে আপনাকে ক্ষুদ্র ও হীন করিও না। তোমার সেই গুহাহিত অনির্ব্বচনীয় রহস্য হারাইও না। যাহাদের অন্তর্দৃষ্টি খোলে নাই, যাহারা আবরণের বাঁধ ভাঙ্গিয়া নিরাবরণের সাক্ষাৎ পায় নাই, তাহারাই কেবল রূপের অভাবে অন্ধকার দেখে, সতত বহিঃপ্রকাশ চায়। কিন্তু হে প্রভু! আজ আমি আমার দর্শনে, আমার স্পর্শনে, আমার আস্বাদে, আমার অনুভূতিতে, তোমাকে পাইতে চাহি না। আজ তুমি তোমাকে ব্যক্ত না করিলেই আমি তোমাকে পাই। আজ তোমার মহাশূন্যে শুদ্ধ নীরবতা, তোমার আঁধার সাগরে তলহীন স্তব্ধতা, আমার অনুরাগের জ্বলন্ত অননুভূতিতে জাগিয়াছে। তোমার সর্ব্বাত্মক প্রণয়মহিমা আমাকে স্তব্ধ করিয়াছে।

"দরশন লাগি, বর নাহি মাগি!"

তাই বলি হে আমার দেবতা, তুমি আজ আমার অদৃশ্য, অস্পৃশ্য, অবোধ্য, অনির্ব্বচনীয়। তুমি কি আমার উপর অভিমান করিয়া নীরব হইয়া আছ। আজ তোমার অভিমানেরই জয় হউক! এ জগতে আমার জন্য, হে স্বামিন্, তোমাকে যেন আর জন্মমৃত্যুর পথে ঘুরিতে না হয়। তাই তোমারই জন্য তোমার বিদ্রোহী হইয়াছি। আমাকে পাইলে যে তুমি আর কাহাকেও চাহ না!

"দরশন লাগি, বর নাহি মাগি!"

কিন্তু নাথ! তোমার অবোধ সৃষ্টির প্রতি তুমি অভিমান করিও না। সৃষ্টিকে তুমি ডাকিও। তুমি না ডাকিলেও আমি তোমাকে চিনি, কিন্তু সৃষ্টি যে তোমার ডাক না শুনিলে, তোমার রূপ না দেখিলে, পথভ্রান্ত হয়। তুমি তাহাদের প্রাণের প্রাণ হইয়া জন্মে জন্মে যুগে যুগে ডাকিতে থাক। নাথ, সৃষ্টিকে তোমার মণিকোঠার আঁধারে দর্শনের নিমিত্ত ডাকিয়া লও, আর আমি মন্দিরের বহির্দ্বারে তাহাদের সোপান হইয়া পড়িয়া থাকি।

"দরশন লাগি, বর নাহি মাগি!"

আমি শুধু আমার বুক পাতিয়া তাহাদের নিমিত্ত সোপান রচনা করি। তোমার সৃষ্টি এই সোপান অবলম্বন করিয়া উঠিতে উঠিতে ক্রমপরম্পরায় তোমার সহিত মিলিত হইতে থাকুক্। আমি যেন তোমার ও তোমার সৃষ্টির সন্ধিস্থল হইয়া থাকি। তীর্থ যাত্রীদের দেহভার বহন করিয়া জগন্নাথের রথযাত্রার পথের ন্যায় ধন্য হই। এই ছায়ার কায়া আশ্রয় করিয়া সকলকে তোমার অনন্তরূপ দেখাই।

ব্যোমকেশ! উপরে অজ্ঞেয় রহস্যরূপী তুমি, আর নিম্নে মানব-সমষ্টিরূপী তোমার অপরিমেয় সৃষ্টি, মধ্যে শুধু আমি। যেন পাতাল হইতে স্বর্গধামের উদ্দেশে কোন গগনস্পর্শী সোপানাবলি, মাঝে থাকিয়া কেবল সেই শূন্য রহস্যের পানে ঊর্দ্ধদৃষ্টি হইয়া পড়িয়া আছি।

শ্রীমতী সরযূবালা দাসগুপ্তা।

কল্যাণী

১

এবারে পূজার সময় পুরুলীয়া গিয়াছিলাম। ছেলেরা ধরিয়া পড়িল, একদিন রাঁচি যাইতে হইবে। রাঁচির পথ নাকি বড় সুন্দর। বাঙ্গালা দেশের আশে-পাশে অমন ঘন নিবিড় জঙ্গল আর কোথাও নাই। রাঁচি রওয়ানা হইলাম বটে, কিন্তু রাঁচি দেখা হইল না। মাঝ-পথে এঞ্জিন ভাঙ্গিয়া গাড়ী আট্‌কাইয়া রহিল। আমার পক্ষে ভালই হইয়াছিল। এটি না হইলে কল্যাণীর সঙ্গে দেখা হইত না।

যাত্রিরা অনেকেই নামিয়া পড়িল। আমরাও নামিলাম। সেখান-টাতে কোনও ষ্টেশন ছিল না। কাছে জনমানবের বসতি নাই। রেলের দুধারে কেবল পাহাড়, খাদ, আর শালবন। লাইনের ধারে ধারে বেড়াইয়া আমরা বনের শোভা দেখিতে লাগিলাম। হঠাৎ গৃহিণী বলিলেন—দেখ, দেখ, ঐ গাছতলায় যেন চাঁদের হাট মিলিয়াছে। চাহিয়া দেখিলাম, তার মাঝখানে দাঁড়াইয়া কল্যাণী। কল্যাণীকে পঁচিশ বৎসর পরে দেখিলাম। আমি আমার কাজে নানাস্থানে ঘুরিয়া বেড়াই। কল্যাণীও কলিকাতায় ক্বচিৎ কখনও যায়। চাইবাসাতে বাড়ী করিয়াছে, সেখানেই থাকে। পঁচিশ বছর পরে দেখিলাম বটে, কিন্তু মনে হইল কাশীতে পঁচিশ বছর আগে যেমনটি দেখিয়াছিলাম, আজ যেন ঠিক তেমনটিই রহিয়াছে। তার সে স্বাস্থ্য, সে সৌন্দর্য্য, সে কান্তির কিছুই কমে নাই, কেবল যাহা অপরিস্ফুট ছিল তাহা যেন আরো ফুটিয়াছে, যাহা অপরিপক ছিল, তাহা পাকিয়াছে, যাহা একটু চঞ্চল ছিল, তাহা স্থির হইয়াছে। তার আশে-পাশে আটটি সন্তান। বড়টির বয়স ছাব্বিশ, ইহা

জানিতাম। ছোটটিকে দেখিয়া মনে হইল, চারি পাঁচ বৎসরের। ছেলেরা কেউ বা দাঁড়াইয়া আছে, কেউ বা ঘাসের উপরে বসিয়াছে, আর বড়টী মা'এর পার কাছে, আপনার বাহুতে ভর করিয়া একটু হেলিয়া পড়িয়াছে। এই চাঁদের হাট দেখিয়া মনে মনে আনন্দ-স্বামীকে প্রণাম করিলাম।

২

কল্যাণীকে তার বাল্যকাল হইতেই আমি চিনি। কল্যাণীর পিতা, রাধামাধব বাবু আমাদের কালেজের ইংরাজি-অধ্যাপক ছিলেন। কিন্তু তিনি কোন্ বিদ্যা যে জানিতেন না, বলিতে পারি না। কালেজে আমরা তাঁর নিকটে ইংরাজিই পড়িতাম, কিন্তু বাড়ীতে যাইয়া দর্শন, ইতিহাস, গণিত, এমন কি সংস্কৃত কাব্য এবং জড়-বিজ্ঞান পর্য্যন্ত রীতিমত পড়িতাম। পড়ান'তে তাঁর কোনও দিন ক্লান্তিবোধ হইত না। কালেজের অধ্যাপকেরা কেবল নোট লিখাইয়া দিতেন। অনেকেই এগুলি মুখস্থ করিয়া পাশ হইয়া যাইত। রাধামাধব বাবুর কাছে যারা পড়িতে যাইত, তাদের নোট মুখস্থ করিতে হইত না, তারা প্রত্যেক বিষয়ে মূলতত্ত্বগুলি নিজের জ্ঞানে ধরিতে পারিত। আর তাঁর পড়াইবার ধরণটা এমন ছিল যে, তাহাতে সকল বিষয়ই বড় মিষ্ট হইয়া উঠিত। রাধামাধব বাবুর একমাত্র সন্তান কল্যাণী। ছেলেবেলা কল্যাণী অনেক সময় বাবার কাছে বসিয়া তাঁর এ সকল অধ্যাপনা শুনিত।

সেই সূত্রেই কল্যাণীর সঙ্গে আমার পরিচয়। সে প্রথম পরিচয়ের কথাটা এখনও মনে আছে। আমি সবে এণ্ট্রেন্স পাশ করিয়া কলিকাতায় আসিয়াছি। রাধামাধব বাবু একদিন আমার একটা ইংরাজি রচনা বাড়ী লইয়া গেলেন। আমাকেও সন্ধ্যার পরে তাঁর বাড়ী যাইতে বলিলেন। তখন তিনি শাঁখারিটোলায় থাকিতেন। একটা ছোট দুতালা বাড়ী। আমি গিয়া দরজার

কড়া নাড়িলাম। "কে ও" বলিয়া একটি আট-নয় বৎসরের বালিকা আসিয়া দরজা খুলিয়া দিল। "ভিতরে আসুন" বলিয়া সে আমাকে হাত ধরিয়া টানিয়া রাধামাধব বাবুর বসিবার ঘরে লইয়া গিয়া বলিল—"বাবা বাড়ী নাই।" কল্যাণীর সঙ্গে সেই আমার প্রথম পরিচয়।

সেই অবধি আমি একরূপ রাধামাধব বাবুর পরিবারভুক্ত হইয়া গেলাম। যখন তখন তাঁদের বাড়ী যাইতাম। অর্দ্ধেক দিন সেখানেই খাইতাম। কল্যাণী আমাকে দাদা বলিয়া ডাকিত, সত্যসত্যই আমাকে তার নিজের সহোদরের মতন দেখিত। বড় হইলেও এ সম্বন্ধের ব্যতিক্রম ঘটিল না। আমারও নিজের ছোট বোন কেউ ছিলনা; কল্যাণীকে পাইয়া আমার সে অভাব দূর হইল।

আমি ক্রমে এম্, এ, পাশ করিয়া বছরখানেক কলিকাতাতেই শিক্ষকতা করি। তারপর, ডিপুটী হইয়া কলিকাতা ছাড়িয়া গেলাম। কল্যাণীর বয়স তখন ষোল-সতের হইবে। কিন্তু রাধামাধব বাবুকে সেজন্য কোনও দিন চিন্তিত দেখি নাই। প্রথম প্রথম কল্যাণীর বিবাহের কথা উঠিলে তিনি বলিতেন ছেলের পঁচিশ ও মেয়ের ষোল বছরের কমে কিছুতেই বিবাহ হওয়া উচিত নয়। লোকে বলিত—সমাজে এ নিয়ম চলিবে না। রাধামাধব বাবু বলিতেন—সমাজে যাই বলুক, শাস্ত্রে এই কথাই বলে। তাঁর বন্ধু বান্ধবেরা বলিতেন—আজকালকার হিন্দুসমাজে অত বড় আইবুড়া মেয়ে রাখা অসম্ভব। রাধামাধব বলিতেন—আমরা কুলীন, আমাদের ঘরে চিরদিনই আইবুড়া মেয়ে থাকিত। ষাট বৎসর বয়সে আমার নিজের পিসীমার গঙ্গালাভ হয়, তাঁর বিবাহ হয় নাই। এ সকল কথা শুনিয়া লোকে রাধামাধব বাবুকে কেউ বা খৃষ্টীয়ান্, কেউ বা ব্রাহ্ম ভাবিত। তাঁর নিজের লোকেরাও ভাবিতেন তিনি ক্রমে ব্রাহ্মসমাজে ঢুকিয়া পড়িলেন।

চা'র বৎসর পরে আমি পূজার সময় কলিকাতায় যাইয়া দেখি,

কল্যাণীর সম্বন্ধ আসিয়াছে। বরটী আমার বিশেষ পরিচিত। কালেজে সে আমার নীচে পড়িত, কিন্তু আমরা এক মেসেই থাকিতাম। সেও কুলীণ ব্রাহ্মণ; এম. এ. পাশ করিয়াছে। দেশে বিষয়-আষয় বেশ আছে। সংসারে তার আর কেউ নাই। অল্পবয়সেই পিতৃমাতৃহীন হয়। বিধবা পিশী তাকে মানুষ করেন, পিসাত ভাই তার বিষয় দেখিতেন। অল্পদিন হইল দুজনাই মারা গিয়াছেন।

এ সম্বন্ধ যখন আসে, আমি তখন রাধামাধব বাবুর কাছেই বসিয়াছিলাম। তিনি চিঠিখানা আমাকে পড়িতে দিলেন। পড়া শেষ হইলে চোখ তুলিয়া দেখিলাম—রাধামাধব বাবুর চোখ ছল ছল করিয়া আসিয়াছে।

পাত্রের নাম ললিত। ললিত সদ্বিদ্বান, সচ্চরিত্র, সদ্বংশজ, সাংসারিক অবস্থা বেশ ভাল। রাধামাধব বাবু কল্যাণীর বিবাহের আশাই একরূপ ছাড়িয়া বসিয়াছিলেন। বিধাতা এমন বর আনিয়া দিবেন, ইহা তিনি কোনও দিন ভাবেন নাই।

চিঠিখানা লইয়া তিনি বাড়ীর ভিতরে গেলেন। আমাকেও ডাকিয়া নিলেন। কল্যাণীর মা ললিতকে বেশ জানিতেন। ললিত এক সময় তাঁর বাড়ীর ছেলের মতই হইয়া পড়িয়াছিল। যখন তখন তাঁদের বাড়ী যাইত। কল্যাণীও নিঃশঙ্কোচে তার সঙ্গে মিশিত। কিছুদিন পূর্ব্বে ললিত যাওয়া-আসা একেবারেই বন্ধ করিয়া দেয়। ডাকিলেও ওজর আপত্তি তুলিয়া এড়াইতে চেষ্টা করিত। ললিতের কি হইয়াছে, বলিয়া রাধামাধব বাবুর গৃহিণী মাঝে মাঝে দুঃখ করিতেন। কল্যাণীর মা এই প্রস্তাবে খুবই সুখী হইলেন। কেবল "কিন্তু" দিয়া বলিলেন, "আর সবই খুব ভাল, ওর সংসারে যে আর কেউ নাই আমি তাই ভাব্‌ছি।"

একটু পরেই কল্যাণী মায়ের কাছে আসিল। রাধামাধব বাবু তার হাতে চিঠিখানা দিলেন। চিঠিখানা পড়িতে পড়িতে তার মুখ লাল হইয়া উঠিল। মাথা হেট করিয়া সে চিঠিখানা ফিরাইয়া দিয়া

নির্ব্বাক, নিশ্চল হইয়া বসিয়া রহিল। রাধামাধব বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, তোর মত আছে ত?

কল্যাণীর মা বলিলেন—তোমার যত সৃষ্টিছাড়া কথা। তোমার আমার মত হলে ও' কি আর 'না' বলবে?

রাধামাধব বাবু বলিলেন—কচি বয়সে বিয়ে দিলে অন্য কথা ছিল আমার মেয়ে বড় হয়েছে। লেখাপড়াও শিখেছে। ভালমন্দ বুঝ্‌বার শক্তি জন্মেছে। আগেকার কাল থাকিলে সে স্বয়ম্বরা হইতে পারিত। তার মত না লইয়া কি আমি কিছু ঠিক করিতে পারি?

কল্যাণীর মা বলিলেন—পুরুষগুলো কি একেবারে দিনকাণা? ওর মুখ দেখে কি বুঝ্‌ছ না, ওর অমত নাই!

মায়ের কথা শুনিয়া কল্যাণী সেখান হইতে সরিয়া পড়িল।

রাধামাধব বাবু তখন তাঁর মায়ের কাছে গেলেন। প্রতিদিন প্রাতে বৃদ্ধা গঙ্গা-স্নান করিয়া আসিলে রাধামাধব বাবু যাইয়া তাঁর পদধূলি লইয়া আসিতেন। এটিই তাঁর একমাত্র প্রকাশ্য সন্ধ্যা-বন্দনা ছিল। আজিও মায়ের পদধূলি লইয়া বলিলেন—মা কল্যাণীর সম্বন্ধ আসিয়াছে।

বৃদ্ধা কথাটা শুনিয়া চমকিয়া উঠিলেন। মুখ বিষণ্ণ হইল। কল্যাণীর বিবাহ হইবে, এ আশা তিনি একেবারে ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। মনে মনে ভাবিতেন, যদি কোনও দিন হয়, তবে ব্রাহ্মসমাজেই হইবে। আর তাঁর মৃত্যুর অপেক্ষাতেই রাধামাধব বাবু ব্রাহ্মসমাজে ঢুকিয়া পড়েন নাই। কিন্তু কন্যার বিবাহের খাতিরে বুঝিবা সে দেরিটুকুও আর সহিল না।

রাধামাধব বাবু মা'য়ের মনোভাব বুঝিলেন। ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন,—মা তোমার জাত যাবার ভয় নাই। বর বামন, আমাদের পাল্‌টি ঘর, তুমি তাকে জান।

বৃদ্ধা চমকিয়া উঠিলেন,—বলিলেন, আমি চিনি? সে কে?'

রাধামাধব বাবু বলিলেন—ললিত।

বৃদ্ধা বলিলেন—আমাদের ললিত!

তাঁর মুখ অপূর্ব্ব-উল্লাসে ভাসিয়া উঠিল, দুই চোখ জলে ভরিয়া গেল। বলিলেন—কল্যাণীর জন্য মনে মনে এই বরটি চাহিয়া আমি এ দুবছর কাল প্রতিদিন শিবের মাথায় বেল-পাতা দিয়াছি। ঠাকুর দুঃখিনীর মান রাখলেন।

৩

কল্যাণীর বিবাহে আমি উপস্থিত ছিলাম। রাধামাধব বাবুর গুরু-দেব এ বিবাহে পৌরোহিত্য করেন। আনন্দস্বামী রাধামাধব বাবুর কুলগুরু নহেন। বহুদিন পূর্ব্বে একবার গয়াধামে রাধামাধব বাবু তাঁর দর্শন লাভ করেন। আনন্দস্বামী বৈষ্ণব সন্ন্যাসী, অনেকে তাঁহাকে সিদ্ধ মহাপুরুষ বলিয়া জানিত। তাঁর নিকটে স্বামী-স্ত্রীতে মন্ত্রদীক্ষা লইয়া, সেই অবধি রাধামাধব বাবু নামব্রহ্মের উপাসনা আরম্ভ করেন। কল্যাণীর বিবাহ ঠিক হইলে, তিনি গুরুদেবকে স্মরণ করি-লেন। শিষ্যের আগ্রহে আনন্দস্বামী কলিকাতায় আসিলেন। রাধা-মাধব তাঁহাকেই কল্যাণীর বিবাহ দিবার জন্য ধরিয়া পড়িলেন। বলিলেন—বাবা, দেশে যে আর ব্রাহ্মণ নাই, আপনার মুখেই একথা শুনেছি। ব্রাহ্মণ নহিলে কল্যাণীর বিবাহ দেয় কে? আনন্দস্বামী বলিলেন, কাশী হইতে বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ আনাইয়া দিবেন। রাধামাধব বলিলেন—বেদজ্ঞ হইলে কি বাবা মন্ত্রজ্ঞ হয়। বেদ ত আজকাল যে সে পড়ে; কিন্তু তার অর্থ জানে কয়জন? আর যারা অর্থ জানে, তারাও ত এ সকলের মর্ম্ম বুঝে না। যদি কচিৎ কেউ মর্ম্মও বুঝে, তারাও ত মন্ত্রের শক্তি ফুটাইতে পারে না। এটা কেবল আপনিই পারেন। আপনি কল্যাণীর বিয়ে না দিলে তার বিয়ে হয় না। আনন্দস্বামী শিষ্যের আবদার অগ্রাহ্য করিতে পারিলেন না। নিজেই কল্যাণীর বিবাহে পৌরোহিত্য

করিলেন। আর বিবাহের পূর্ব্বে সাত দিন ধরিয়া কল্যাণীকে বিবাহের শাস্ত্রীয় বিধি ও বৈদিক মন্ত্রাদি ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিলেন।

রাধামাধব বাবু কল্যাণীকে বেশ ভাল লেখাপড়া শিখাইয়াছেন। সাহিত্য, ইতিহাস, দর্শন, এমন কি মোটামোটি জড়বিজ্ঞান এবং শরীরতত্ত্ব পর্য্যন্ত সে শিখিয়াছে। গুরুদেবের মুখে হিন্দু বিবাহের মন্ত্রের ব্যাখ্যা শুনিয়া সে বিস্ময়ে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। এ যে কেবল ধর্ম্ম নয়, কিন্তু জীববিজ্ঞান; শরীরতত্ত্ব, মনস্তত্ত্ব, রসতত্ত্ব, সমাজ-বিজ্ঞান, এমন কি আধুনিক ইউজেনিক্স্ বা সুপ্রজনন-বিদ্যার মূলতত্ত্বগুলির উপরে হিন্দুর বিবাহ-সংস্কার প্রতিষ্ঠিত। এ সকল কথা বিবাহের মন্ত্রের ভিতরে লুকাইয়া আছে। এতদিনে বিবাহ ব্যাপারটী যে কি, কল্যাণী বুঝিতে পারিল। বুঝিয়া তাহার প্রাণ দমিয়া গেল।

যথাসময়ে আনন্দস্বামী কল্যাণীর বিবাহ দিলেন। যাঁরা এ বিবাহে উপস্থিত ছিলেন, তাঁরা একবাক্যে বলিয়াছেন, জন্মে কখনও এমন বিবাহ দেখেন নাই। এই মহাপুরুষ যখন ললিতকে মন্ত্রগুলি পড়াইতে লাগিলেন, তখন প্রত্যেক মন্ত্রটী যেন সজীব হইয়া উঠিয়াছিল। আর এই সকল মন্ত্র-প্রভাবে কল্যাণীর ফুল্ল-যৌবনের উচ্ছ্বসিত রূপরাশি অলৌকিক লাবণ্যে উদ্ভাসিত হইয়া [illegible]াহাকে সাক্ষাৎ ভগবতীর মতন দেখাইয়াছিল।

[illegible]ল্যাণীর বিবাহে সকলের চাইতে বেশী আনন্দ হইল তার [illegible]র। এই জন্যই যেন তিনি এতকাল পুত্রের সংসারে বাঁধা [illegible]ন। কল্যাণী স্বামীর ঘর করিতে গেলে, তার ঠাকুর-[illegible]লিয়া গেলেন।

৪

[illegible]হ হইয়া গেলে আমি আমার কর্ম্মস্থলে ফিরিয়া [illegible]সে আমার ছোট হইলেও, সখ্যের হিসাবে একই

বন্ধুদলভুক্ত ছিল। একটী বন্ধু লিখিলেন—ললিতের উদ্বাহ শেষে উদ্বন্ধনে দাঁড়াইয়াছে। আমরা তার টিকি পর্য্যন্ত আর এখন দেখিতে পাই না। তার এখন—

উঠিতে কল্যাণী বসিতে কল্যাণী
কল্যাণী হইল সারা,
কল্যাণী ভজন, কল্যাণী পূজন
কল্যাণী নয়ন তারা।

আমি লিখিলাম, শৈশবে যেমন দাঁত ওঠা, যৌবনে সেইরূপ বিয়ে-টাও কারও কারও হয়। টিদিং অর বিয়ে—দুয়েতেই তারি কনষ্টিটিউষন্যাল্ ডিষ্টারবেন্স্ হয়। ললিতেরও দেখ্‌ছি তাই হয়েছে। ললিতকে লিখিলাম—লোকে বলে তোমার নাকি বিয়ে হয় নাই, মৃত্যু হয়েছে। কল্যাণী কি তোমাকে গিলিয়া বসিয়াছে, না তুমিই তাকে গিলিয়া এখন অজগর হইয়াছ, আর নড়িতে চড়িতে পার না। যেই যাকে গিলিয়া থাক, হজম করা শক্ত হবে। কল্যাণী কথাগুলি পড়ুক, এর জন্য পোষ্ট কার্ডে লিখিলাম। তাহাই হইল। কল্যাণী আমাকে লিখিল—

"আপনার পোষ্টকার্ড খানা আমার হাতে পড়িয়াছে। আমি কি বলিব, সত্যি আমার মরিতে ইচ্ছা হয়। আমি ওঁকে কত বলি—তুমি তোমার বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গ একেবারে ছাড়্‌লে, তাঁরা কি যে ভাব্‌ছে, তা তুমি দেখ না। উনি বলেন—ওদের বাজে বার্ত্তায় তাঁর মাথা ধরে। আমি জমিদারীতে যেতে বলেন, ম্যাজিষ্ট্রেটের সঙ্গে তাঁর ঝগড়া, কোন ক্যাসাদে পুরে দিবে, তার জন্য যান না। আমি বলি, প্রতিদিন ময়দানে গিয়ে হাওয়া খেয়ে আসা উচিত হাঁটলে তাঁর প্যালপিটেষণ্ হয়। আমি মাঝে যাই, কিন্তু গিয়ে দু'দণ্ড থাক্‌তে পারি না—তা

যায়। আমি কি করি বলুন? আমি ত হার মেনেছি। আপনি যদি কিছু করতে পারেন, তারই জন্য আপনাকে লিখ্‌ছি।"

৫

বৈশাখ মাসে ঈষ্টারের ছুটিতে কল্যাণীর [illegible] হয়। আবার বৈশাখ ঘুরিয়া আসিল। তখন আমি মৈমনসিংহে ছিলাম। তিন মাসের ছুটি লইয়াছি। মৈমনসিংহে সেবারে আমরা একটা স্বারস্বত সম্মিলনের আয়োজন করি। আমি ললিতকে নিমন্ত্রণ করিয়া পাঠাইলাম। সম্মিলনের পরে কলিকাতায় যাইয়া তার বাড়ীতে কিছুকাল থাকিব, লিখিলাম। ললিত মৈমনসিং আসিল। পাঁচ সাত দিন আমার বাড়ীতেই ছিল। পরে দুইজনে কলিকাতা যাত্রা করিলাম।

কলিকাতা পৌঁছিয়া দেখিলাম, কল্যাণী বাড়ী নাই। ললিতের চাকর আসিয়া বলিল—পূর্ব্বদিন সন্ধ্যাবেলা কল্যাণী বিছানাপত্র লইয়া কোথায় গিয়াছেন, সে সঙ্গে যাইতে চাহিয়াছিল, সঙ্গে নেন নাই। এই বলিয়া সে ললিতের হাতে একখানা চিঠি দিল। নিজে পড়িয়া ললিত চিঠিখানা আমার হাতে দিয়া, মাথায় হাত দিয়া বসিল। কল্যাণী লিখিয়াছে—

"প্রাণপ্রতিমেষু,

আমার এ চিঠি যখন তোমার হাতে পড়িবে, তখন আমি অনেক দূরে, কত দূরে তুমি কল্পনা করিতে পারিবে না। তোমার অত্যন্ত ক্লেশ হইবে, জানি; আমারও যে ক্লেশ কম হইতেছে, ইহা ভাবিও না। কিন্তু আমার চলিয়া যাওয়া ভিন্ন আর উপায় নাই। অনেক দিন ধরিয়া এটাকে এড়াইতে অনেক চেষ্টা করিয়াছি, এড়াইতে পারিলাম না। কোথায় যাইতেছি বলিলাম না, মা বাবাও জানেন না। কেন যাইতেছি, তোমাকে বলিতে পারি না, তাঁদেরেও পারিব না। তোমাদের সকলের পায়ে ধরিয়া বলিতেছি, আমার খোঁজ করিও না, করিলেও পাইবে না। তোমারই—কল্যাণী।"

দু'জনে রাধামাধব বাবুর বাড়ী গেলাম। রাধামাধব বাবুকেও কল্যাণী একখানা চিঠি লিখিয়াছে। অল্পক্ষণ পূর্ব্বেই সেখানা ডাকে আসিয়াছে। রাধামাধব বাবু চিঠিখানা হাতে লইয়াই বসিয়াছিলেন। আমাদের দেখিয়া [illegible] লিতের হাতে চিঠিখানা দিলেন। কল্যাণী বাবাকে লিখি[illegible]

"শ্রীশ্রীচরণেষু,

বাবা, আমি বাড়ী ছাড়িয়া চলিলাম। কোথায় যাইতেছি বলিতে পারিব না। কি হইবে ভগবান জানেন। মা'র প্রাণে খুব লাগিবে, জানি। কিন্তু আমার আর উপায়ান্তর ছিল না। আমার জীবন আর আমার নয়। স্বপ্নে কোনও দিন ভাবি নাই, তোমাদের এমন কষ্ট দিব। সকলই বিধাতার ইচ্ছা। তোমরা আমার ভক্তিপ্রণাম লইবে। ঠাকুরমাকে আমার ভক্তিপ্রণাম জানাইও। সেবিকাধম সেবিকা—কল্যাণী।"

আমরা আসিবার পূর্ব্বেই কল্যাণীর মা সব শুনিয়াছিলেন। তাঁরা কিছুতেই এ রহস্য ভেদ করিতে পারিলেন না। ললিতের চিঠিখানাও দেখিলেন, তাহাতেও বিষয়টার কোনও কুলকিনারা হইল না।

আমি ছুটীর অধিকাংশটাই কলিকাতায় কাটাইব মনে করিয়াছিলাম। ললিতের অবস্থা দেখিয়া সে সংকল্প আরও দৃঢ় হইয়াছিল। ললিতের বাড়ীর পাশেই একটা বাড়ী ঠিক করিয়া, আমার ছেলেপিলেদেরে আসিতে লিখিলাম। কিন্তু তাহাতে বাধা পড়িল। তিন দিন পরে, গৃহিণীর জ্বরাতিসার হইয়াছে, তারে খবর পাইলাম। আমাকে তখনি মৈমনসিং ফিরিতে হইল।

৬

পারিবারিক অসুখ ও অস্বস্তির ভিতরে মাসেক কাল আমি ললিতের কোনও খবর লইতে পারি নাই। তারপর যখন তাহার

খবর লইলাম, তখন সে আমার কোনও প্রশ্নের উত্তর দিল না। কেবল লিখিল,—তুমি যার খবর জানিতে চাহিয়াছ, তার কোনও খবর লই নাই, পাই নাই, লইবও না, পাইতেও চাই না। পোষ্ট-কার্ডখানা পড়িয়া বড় উদ্বিগ্ন হইলাম। বুঝিলাম ললিত একটা কিছু সিদ্ধান্ত করিয়া বসিয়া আছে। তাহা কি, পরে শুনিয়াছি।

আমি চলিয়া আসিলে ললিত প্রথমে তন্ন তন্ন করিয়া কল্যাণীর বাক্স, আলমারী, দেরাজ প্রভৃতি তল্লাস করিয়া দেখে। কিন্তু তাহাতে কোনও ফল হইল না। তারপর হঠাৎ, তার শোবার ঘরের কোণে একখানা চিঠি কুড়াইয়া পাইল। গ্রাম-সম্পর্কে রাধামাধব বাবুর একটী ভাগিনেয় ছিল। সে প্রথমে আমাদের কালেজেই পড়িত। আমি যখন এম. এ. দেই, তখন সে এফ্. এ. পড়ে। তারপর মেডি-কেল কালেজে যায়। একসময় মনে হইয়াছিল বুঝিবা তারই সঙ্গে কল্যাণীর বিবাহ হইবে। ললিত সে কথা জানিত। কল্যাণীর বিবাহের পরে সে একদিন মাত্র কল্যাণীকে দেখিতে আইসে। কিন্তু কল্যাণী সর্ব্বদাই তার কথা কহিত, আর সে কেন যে তাকে দেখিতে আসে না, এজন্য দুঃখ করিত। চিঠিখানা তারই লেখা। সে ডাক্তারি পাশ করিয়াছে, সরকারী কর্ম্ম পাইয়াছে, শীঘ্রই বর্ম্মায় চলিয়া যাইবে। বর্ম্মা তখনও ভাল করিয়া ইংরেজের দখলে আসে নাই। হাঙ্গেমাই মারা-মারি কাটাকাটি চলিতেছিল। সেখানে ইংরাজের কর্ম্মচারিদের অবস্থা বড় নিরাপদ ছিল না। তাই সে লিখিয়াছে—তোমার সঙ্গে এ জীবনে আর কখনও দেখা হইবে কি না, জানি না। কিন্তু যতদিন বাঁচিব, যেখানেই থাকি, তোমাদের ভালবাসা ভুলিতে পারিব না। সে বিজন বিদেশের মর্ম্মান্তিক একাকিত্বের মধ্যে তোমাদের স্মৃতি আমার এক মাত্র সঙ্গী হইয়া থাকিবে। এই চিঠিখানা পড়িয়া ললিত ভাবিল, সব বোঝা গিয়াছে। বাড়ীর চাকরবাকরদের জিজ্ঞাসা করিয়া জানিল আবার দিন দুই আগে একটী বাবু সারাদিন কল্যাণীর সঙ্গে কাটাইয়া গিয়াছেন। বর্ম্মার জাহাজের সন্ধান লইয়া জানিল, যে রাত্রিতে

কল্যাণী চলিয়া যায় সেই রাত্রেই বর্ম্মার জাহাজও কলিকাতা হইতে গিয়াছিল। ললিত তারপর আর কল্যাণীর কোনও খোঁজ করিল না। মুখেও আর তার নাম লইত না।

গৃহিণীকে লইয়া যমের সঙ্গে টানাটানি করিতেই আমার ছুটী ফুরাইয়া গেল। তাঁর হাওয়া বদলান আবশ্যক। আবার ছুটি চাহিলাম, কিন্তু পাইলাম না। ললিতের সঙ্গে দেখা করিবার বা কল্যাণীর খোঁজ লইবার আর সুযোগ জুটিল না। তারপর বড়দিনের ছুটীতে কলিকাতায় গেলাম। গিয়া দেখিলাম রাধামাধব বাবু পেন্‌শন্ লইয়া কাশী চলিয়া গিয়াছেন। আর বন্ধুবান্ধবেরা বলিলেন—ললিত গোল্লায় গিয়াছে।

শুনিয়া বড় একটা বিস্মিত হইলাম না। ললিতের হৃদয়টা যে বেশী দিন নিরাশ্রয় হইয়া থাকিবে, এ কল্পনা আমি করি নাই। সে প্রকৃতি তার নয়। ললিতের পিতা চারিবার বিবাহ করেন, ললিত তাঁর চতুর্থ পক্ষের সন্তান। ভেরেণ্ডা গাছে যেদিন তেঁতুল ফলিবে, সেদিন ললিতের রক্তে ব্রহ্মচর্য্য ফুটিতে পারে, তার আগে নয়। কল্যাণীকে হারাইয়া, ললিত প্রথমে প্রথমে মনে মনে বিবিধ রসমূর্ত্তির সৃষ্টি করিয়া তাঁহারই মধ্যে নিরাশ্রয় প্রাণের আশ্রয় খুঁজিতে লাগিল। এ আশ্রয় তার মিলিল। অল্পদিন মধ্যেই সে একখানা উৎকৃষ্ট উপ-ন্যাস রচনা করিল। উপন্যাস খানিতে সাহিত্যজগতে একটা প্রবল আন্দোলন জাগাইয়া তুলিল। ললিত বেনামী করিয়া বইখানা ছাপাইল। আমি মৈমনসিং'এ থাকিয়াই বইখানি পড়িয়াছিলাম। বাঙ্গালা সাহিত্যে এই গ্রন্থে এক নূতন যুগ আনিয়াছে, সকলেই বলিতে লাগিল, আমারও তাহাই মনে হইল। ক্রমে থিয়েটারের কর্ত্তারা বইখানি অভিনয় করিতে চাহিলেন। ললিত নিজেই তাহা নাটকাকারে পরিণত করিল। নাটকখানি তাদের খুব পছন্দ হইল। ললিত তখন লিখিল—এ'খানির অভিনয় করিতে হইলে রিহিয়ার্শেলটা তার মনোমত করিতে হইবে। সে যেরূপ চায়, সেরূপ অভিনয়ের

সম্ভাবনা না থাকিলে তার নাটক খানিকে সে কোনও রঙ্গমঞ্চে উপস্থিত করিতে দিবে না। থিয়েটারের কর্ত্তৃপক্ষেরা তাহার উপরেই রিহিয়ার্শেলের ভার দিলেন। ললিত নিজেই রিহিয়ার্শেল করাইতে লাগিল। বন্ধুবান্ধবেরা বলিলেন—ঐ পথেই সে গোল্লায় গিয়াছে।

৭

কিন্তু ললিতের সঙ্গে একটিবার দেখা না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। দু'তিন দিন তার বাড়ী গেলাম,—সকালে গেলাম, দুপোরে গেলাম, সন্ধ্যায় গেলাম, রাত্রে গেলাম—দেখা হইল না। বেহারা বলিল, কখন আসে কখন যায়, ঠিকানা নাই। তারপর থিয়েটারে গেলাম। প্রথম দিন সে সেখানে আছে, শুনিলাম; কিন্তু দেখা পাইলাম না। পরের দিন থিয়েটার ভাঙ্গা পর্য্যন্ত বসিয়া রহিলাম। তারপর দেখিলাম ললিত একটী স্ত্রীলোকের সঙ্গে গাড়ী করিয়া চলিয়া গেল। আমার ছুটীর আর দু'দিন মাত্র আছে, সে রাত্রে ললিতের সঙ্গে দেখা না হইলে এ যাত্রায় আর হয় না। আমিও একখানা গাড়ী লইয়া তার পশ্চাতে পশ্চাতে ছুটিলাম। অবিলম্বেই আমার গাড়ীও সেই বাড়ীর দরজায় যাইয়া দাঁড়াইল। ললিত ও সেই স্ত্রীলোকটী সবে গাড়ী হইতে নামিয়াছে। আমিও গাড়ী হইতে নামিয়া তাদের পিছনে পিছনে বাড়ী ঢুকিলাম। ললিত স্ত্রীলোকটীর পশ্চাতে যাইতেছিল, দুতালার সিঁড়িতে উঠিবার জন্য যেহ সে পা বাড়াইয়াছে, এমন সময় আমি তার কাঁধে হাত দিয়া বলিলাম—ললিত!

ললিত চমকিয়া উঠিল, ফিরিয়া নির্ব্বাক্ নিষ্পন্দ হইয়া দাঁড়াইল। স্ত্রীলোকটীও মুখ ফিরাইয়া দাঁড়াইল। আমি বলিলাম—"আমায় চিন্‌তে পার্‌ছ না? এই পাঁচদিন তোমাকে খুঁজে খুঁজে হায়রাণ্ হয়েছি। আমার ছুটী ফুরাইয়াছে, কালই চলিয়া যাইতে হইবে। কিন্তু তোমার সঙ্গে দেখা না করে যেতে পারি না। তাই এখানে এসে এ বেয়াদবি কর্‌লাম।

স্ত্রীলোকটী বলিল—"আপনারা উপরে আসুন, সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে কেন ?" ললিত নিঃশব্দে উপরে উঠিতে লাগিল, আমিও তার পশ্চাৎ পশ্চাৎ উপরে উঠিলাম। স্ত্রীলোকটি সিঁড়ির পাশের একটা ঘরের দরজা ঠেলিয়া, আমাদিগকে সেখানে বসিতে বলিল। ঘরে ঢুকিয়া দেখিলাম, তাতে যেন একটা সংযমের ও ভদ্রতার হাওয়া বহিতেছে। আস্‌বাব্‌গুলি সামান্য মূল্যের, কিন্তু বড় নিপুণতাসহকারে সাজান। আমি একখানা কৌচে বসিলাম, ললিত আমার পাশেই বসিল। আমি কি বলিব, ঠিক করিতে পারিলাম না। শেষটা কেবল কথা না কহিলে নয় বলিয়া, জিজ্ঞাসা করিলাম, "ভাল আছ ত ?" ললিত বলিল "আছি।"

আবার কথা বন্ধ। এবারে আমার সুবুদ্ধি জুটিল। বলিলাম, "সুরমা বইখানা যে তোমার 'তা' এই সেদিন শুনেছি। আগেই পড়েছিলাম। বঙ্কিমচন্দ্রের পরে অমন উপন্যাস বাঙ্গলায় আর হয় নাই। কোনও কোনও দিক দিয়া মনে হয় বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস যা কর্‌তে পারেনি, তুমি এখানে তাই করেছ। তোমার চরিত্রগুলি কল্পিত বলে আদৌ বোধ হয় না। দিনরাত যাদের সঙ্গে ঘরকন্না করি, তারাই যেন তোমার বইএর ভিতর চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়ায়। আর নাটকখানাও অতি চমৎকার হয়েছে। আজ অভিনয় দেখ্‌লাম। অমন অভিনয় এদেশে হতে পারে, আমার ধারণা ছিল না।" ললিতের মুখের বাঁধন খুলিয়া গেল। কি করিয়া প্রথমে উপন্যাসটী লিখিয়াছিল, এই খানি লিখিতে গিয়া তার ভিতরে কি যুগান্তর উপস্থিত হয়, তারপর কি করিয়া এখানিকে নাটকাকারে পরিণত করে, সব বলিতে লাগিল। তারপর অভিনয়ের কথা বলিতে যাইয়া, আর বলিতে পারিল না। কি যেন বুকের ভিতর হইতে তার মুখের কথা বন্ধ করিয়া দিল।

আমি বলিলাম—"ইনিই না তোমার নাটকের নায়িকা সাজেন ? এরই নাম কি রসমঞ্জরী ? বাঙ্গলারঙ্গমঞ্চে এমন করিয়া কেউ কখনও কোন চরিত্রকে ফুটাইয়াছে বলিয়া মনে হয় না।"

ললিত বলিল—"এখন ইহাকে দেখিলে এ কথা তোমার বিশ্বাস হ'বে না। অমন সামান্য স্ত্রীলোকের ভিতর অমন অসামান্য অদ্ভুত শক্তি ও প্রতিভা কোথাও দেখি নাই, থাক্‌তে পারে বলিয়াও আগে কল্পনা কর্‌তে পার্‌তাম না। দেখা কর্‌বে?"

আমি বলিতে যাইতেছিলাম, "এখন থাক্‌"; কিন্তু মুখ হইতে বাহির হইয়া পড়িল—"দেখ্‌তে ইচ্ছা হয় বটে।"

ললিত তাঁহাকে ডাকিয়া আনিল। দেখিলাম সত্যই এ মানুষ সে মানুষ নয়। সে তেজ, সে দীপ্তি, সে কিছুই নাই। সেখানে একটা বিশ্বগ্রাসিনী, বিশ্ববিজয়িনী শক্তির প্রকাশ দেখিয়াছিলাম। এখানে দেখিলাম অনুপম কোমল-প্রকৃতির একটী শ্রীমতী বাঙ্গালীর মেয়ে। কিন্তু একটী বস্তু সেখানে ঐ রঙ্গমঞ্চেও ছিল, এখানে এই ঘরের মাঝেও আছে, তাহা চরিত্রের অসাধারণ বৈশিষ্ট্য। এই বস্তু-টিকেই ইংরাজিতে Character বলে। দেখিলাম মুখের ভিতরে এমন একটা কিছু ফুটিয়া আছে, যাহা আপনা হইতে চিত্তে সম্ভ্রম জাগাইয়া দেয়। দেখিয়া বন্ধুদের কথা মনে পড়িল—"ললিত গোল্লায় গিয়াছে।"

রূপ আছে, ইহা অস্বীকার করিতে পারিলাম না। কিন্তু এ ব্যক্তি যে রাজ্যের লোক এ রূপ সে রাজ্যের নহে। এ রূপ দেহ-গঠনের পারিপাট্যে ফুটিয়া উঠে নাই, কিন্তু স্বাস্থ্যের আভাতে উদ্ভা-সিত। ইহার কান্তি লাবণ্যের। ইহার মধ্যে অপূর্ব্ব স্নিগ্ধতা আছে, জ্বালা নাই। এ রূপ আত্মসম্ভাবিত নহে, ইহাতে আত্মবিস্মৃতি আছে। দেখিয়া বিস্মিত হইলাম। যত দেখিতে লাগিলাম, ততই কাণে বন্ধু-দের কথা বাজিতে লাগিল—ললিত গোল্লায় গিয়াছে।

কি কথা কহিব, খুজিয়া পাইলাম না। অভিনয়ের কথাটাই তুলিলাম, কথা খুলিল না। মনে হইল এ যেন কলাজগতের কোন কিছুই জানে না। ভাবিলাম এ মানুষের ভিতরে কি দুটা ব্যক্তিত্ব আছে? এরই নাম কি—Dual Personality?

তার মুখে দু'চারিটী কথার বেশী শুনিতে পাইলাম না। কিন্তু এ দুচারিটী কথাতেই বুঝিলাম, এ সামান্য স্ত্রীলোক নয়। জাত, কুল, ব্যবসা তার যাই হউক না কেন, দেবতা ইহার মধ্যে এখনও সজাগ আছেন। উঠিবার সময় সে আমাকে অতিশয় নত হইয়া নমস্কার করিল বটে, কিন্তু আমি তাহাকে মনে মনে প্রণাম করিলাম।

আমি ললিতকে গোল্লায় হইতে টানিয়া তুলিতে আসিয়াছিলাম, এই রমণী আমার সে শক্তি হরণ করিল।

৮

ললিতের সঙ্গে তার বাড়ীতেই ফিরিয়া গেলাম। গাড়ীতে দু'-জনার কাহারও মুখেই কোনও কথা ফুটিল না। সেই নীরবতা লই-য়াই দুজনায় ললিতের শোবার ঘরে যাইয়া একখানা কোচে বসিলাম। হঠাৎ আমি বলিয়া উঠিলাম—তার পর!—কি ভাবিয়া, কোন্ স্বপ্নঘোরে যে বলিলাম মনে নাই। কিসের পর, কি জানিতে চাহিয়াছিলাম, বস্তুতঃ পূর্ব্বাপর কিছুই ছিল কি না, তাহাও জানি না। কেবল ঐ প্রথম কথাটাই এখনও মনে আছে।

ললিত আগে কড়ির দিকে নির্নিমেষ দৃষ্টিতে চাহিয়া ছিল, এবারে মাথা হেট করিয়া আনত চক্ষু দুটী মেজের উপরে রাখিল। ডান হাতের তর্জ্জনীতে কোঁচার খুঁট জড়াইতে জড়াইতে বলিল—আমি ইহাকে বিবাহ করিতে চাই, কিন্তু সে কিছুতেই রাজি হয় না।

আমার আপাদমস্তক শিহরিয়া উঠিল। অজ্ঞাতসারে মুখে কল্যাণীর নাম বাহির হইয়া পড়িল।

ললিত বলিল—"মানুষকে ভূতপ্রেতে পাইলে দেবতার নামেই শান্তি স্বস্ত্যয়ন করে।"

আমার মুখে কথা সরিল না। খানিক পরে ললিত আমার

মুখের দিকে চোক তুলিয়া কহিল—"তুমি যে বড় আমায় দেখ্‌তে এলে? এ সংসারে কেহই ত আমার খোঁজ করে না।"

বহু বহু দিন যা করি নাই, আজ তাহাই করিলাম—ললিতকে টানিয়া বুকের ভিতরে জড়াইয়া ধরিলাম। চোক বুজিয়া আসিল। সেই নিমীলিতনেত্রে কল্যাণীর ছবি আপনা হইতে ফুটিয়া উঠিল। ললিত আমার বুকে মাথা গুঁজিয়া শীতার্ত্ত বালকের মতন্ কাঁপিতে লাগিল। কতক্ষণ যে দু'জনায় এ ভাবে ছিলাম, জানি না। তারপর ললিত সোজা হইয়া উঠিয়া বসিল, বলিল—"তোমায় পেয়েছি ভালই হয়েছে। তোমার সাম্‌নে আজ হিসাব নিকাষ কর্‌ব।"

বলিয়াই উঠিয়া তার বসিবার ঘরে গেল। সেখান হইতে এক-তাড়া চিঠি হাতে লইয়া আসিয়া আমার কাছে বসিল। চিঠির তাড়াটা খুলিতে খুলিতে বলিল—

"তুমি আমার কথা সবই জান। একরূপ বাল্যকাল হইতেই জান। তারপরও সব জান। সে কথা তুলিব না। তুমি সেবারে আমাকে কি অবস্থায় দেখিয়া গিয়াছিলে, তাও জান। তারপর—"

ললিতের কথা আটকাইয়া গেল। একটু পরে ক্ষীণ স্বরে বলিল —"জানিলাম সে বর্ম্মায় চলিয়া গিয়াছে।"

আমি উত্তেজিত হইয়া বলিলাম—"কি?"

ললিত আমার হাতে একখানা চিঠি দিয়া বলিল—"এই দেখ, তুমি চলিয়া গেলে, এখানা ঘরের শোবার কোণে কুড়াইয়া পাইয়াছি।"

আমি চিঠিখানা পড়িয়া বলিলাম—"তুমি পাগল।"

ললিত বলিল—"পাগল হই আর ছাগল হই, আমার জীবনের সে অঙ্ক শেষ হইয়া গিয়াছে। তার স্মৃতি প্রেতিনীর মতন আমাকে তিন মাস কাল দিন রাত তাড়া করিয়া বেড়াইয়াছিল। ক্রমে "সুর-মার" স্বপ্ন রচনা করিতে যাইয়া, সে জ্বালা কমিয়া গেল। কিন্তু দুধের সাধ কি জলে মিটে? না, স্বপ্নে পাঁচ তরকারী দিয়া পেট ভরিয়া খাইলে জাগ্রতের ক্ষুধার যাতনা নষ্ট হয়। প্রাণের শূন্যতা

গেল না। যতক্ষণ ভাব্‌তাম ও লিখ্‌তাম ততক্ষণ বেশ থাক্‌তাম, তার-পর—তারপর তুমি ত সবই দেখ্‌লে। যা ভাব্‌তে ইচ্ছা হয়, তাই ভাব। আমার কোনও ভয় ভাবনা নাই।”

খানিক পরে বলিল—আমি বিবাহ করিতে চাহিয়াছিলাম, এখনও চাই; কিন্তু সে যে কিছুতেই রাজি হয় না।

আমি বলিলাম,—না হইবারই কথা।

ললিত একটু গরম হইয়া বলিল—তুমি তাকে জান না বলেই অমন কথা বল্‌ছ।

আমি বলিলাম—যা দেখেছি ও জেনেছি, তাতেই একথা বল্‌ছি।

ললিত বলিল—তুমি কি মনে কর যে ওরাজ্যে কখনও কোন ভাল লোক থাক্‌তে পারে না।

আমি বলিলাম—ভাল মন্দের বিচার করিবার আমি কে?

ললিত বলিল—তুমি বিশ্বাস কর্‌বে না, ওকে না দেখ্‌লে আর ওর সকল কথা ভাল কর না জান্‌লে আমিও বিশ্বাস কর্‌তে পার্‌তাম না। এ ভদ্রলোকে'র মেয়ে—

আমি বলিলাম—তা বিশ্বাস করার বাধা কি? অনেকেই ত তাই।”

ললিত বলিল—সে ভাবে নয়। সে অর্থে ভদ্রঘরে তার জন্ম হয় নাই। কিন্তু কুল মন্দ হইলেও, রক্তটা ভাল। আর কেবল আর্টের আকর্ষণেই থিয়েটারে ঢুকিয়াছে, নতুবা জীবিকার ব্যবস্থা বেশই ছিল। মা মরিয়া গেলে, কথা কইবার লোক ছিল না। তখন দুই পথ তার সম্মুখে খোলা ছিল। এক, যে পথে সবাই যায়, আর যে পথ সে ধরিয়াছে। তুমি শুনিয়া আশ্চর্য্য হইবে, থিয়েটারের আলাপ পরিচয়টা তার থিয়েটারের চতুঃসীমানার ভিতরেই আবদ্ধ। আমিই প্রথম এ লক্ষণের গণ্ডী পার হইবার অধিকার পাইয়াছি। আর এই-টুকু না পাইলে, আজ আমি কোথায় যাইতাম জানি না।”

থানিক চুপ করিয়া থাকিয়া, ললিত আবার বলিল—ও যে কিছু-তেই বিয়ে কর্‌তে রাজি হয় না, না হইলে আমার আর কোনও দুঃখ থাকিত না। আর যে ভাবে আমার বিবাহের প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিয়াছে, তার উপরে আমার কোনও কথাও যে চলে না।

ললিত নীরবে হাতের চিঠির তাড়া হইতে একখানি চিঠি বাহির করিয়া, পড়িতে লাগিল। চিঠিখানা বড় নয়, কিন্তু ললিতের পড়া যেন শেষ হইতে চাহে না। অনেকক্ষণ পরে অতি মৃদুভাবে সে-খানা আমার হাতে দিল। বোধ হইল আমার হাতে দিতে যেন তার প্রাণে কি একটা ভয় জাগিতেছে। আমি পড়িলাম—

"সুহৃদ্বরেষু,—

তোমাকে এই আমি প্রথম পত্র লিখিতে বসিলাম। বাবার মৃত্যুর পরে, একবার কেবল যে থিয়েটারে আমি এখন আছি তার অধ্যক্ষ মহাশয়কে একখানা চিঠি লিখিয়াছিলাম, আর জন্মে কাউকে লিখি নাই। মুখে আমার কথা ভাল ফোটে না, তুমি জান। মুখে সকল কথা তোমাকে বুঝাইতে পারিব না, ভয় হয়। তাই লিখিতে বসি-লাম।

আমার জীবনের আগেকার কথা তুমি সবই জান। তারপর তোমার সঙ্গে দেখা। তুমি কোন্ পথে আমার জীবনে আসিয়াছ, তাহা জান। আমার জীবনের ঐ একটী পথই বাল্যাবধি খোলা ছিল, আর পথ ছিল না, এখনও নাই। আমি জীবনে যা কিছু পাই-য়াছি, ঐ পথেই আসিয়াছে। সেই পথেই তোমাকেও আমার জীব-নের সহায় রূপে বরণ করিয়াছি, সেই পথেই তোমার জীবনের সহ-চরী হইয়া তোমার সেবা করিবার অধিকার লইয়াছি। অন্যপথে আমার এ অধিকার নাই। এই জন্যই তুমি যে প্রস্তাব করিয়াছ, আমি তাহাতে কোনও মতেই সম্মত হইতে পারি না। তুমি আমার জীবনে আসিবার আগে, আমি অপরের রস-মূর্ত্তিকেই রঙ্গমঞ্চে ফুটাই-তাম, নিজে রসমূর্ত্তির সৃষ্টি করিতে পারি নাই। তুমি আমাকে দিয়া

এইটি করাইয়াছ। আমিও তোমার নিত্য নূতন রস-সৃষ্টির সাহায্য করিতে পারিলেই কৃতার্থ হইব। তোমার সন্তানের জননী হইবার অধিকার আমার নাই। তুমি পুরুষ, আমি যে স্ত্রীলোক। পুরুষের পিতৃত্ব বুদ্বুদের মতন উপরে ভাসিয়া থাকে, রমণীর মাতৃত্ব তার হাড়ে হাড়ে ঢুকিয়া যায়। আমি বাবাকেও দেখিয়াছি, মাকেও দেখিয়াছি। আর মার কথা ভুলিতে পারি না বলিয়াই তোমার প্রস্তাবে রাজি হইতে পারি না। তুমি আমার জন্মকথা অগ্রাহ্য করিতে পার, আমি যে পারি না। আর আমি ভুলিয়া গেলেই, আমার সন্তানও কি তাহা ভুলিতে পারিবে? আমি তোমার জন্য প্রাণ দিতে পারি, কিন্তু তোমাকে সুখী করিবার জন্যও যারা এখনও জন্মায় নাই, তাদের সম্ভ্রম ও মর্য্যাদা আগে হইতে জন্মের মতন নষ্ট করিয়া রাখিতে পারি না। আমার প্রাণের বেদনা কি তুমিও বুঝিবে না? মুখে সব কথা তোমাকে বুঝাইয়া বলিতে পারিতাম না, তাই এই দীর্ঘ পত্র লিখিলাম। এই কথা তুলিয়া আর আমাকে যাতনা দিও না।"

কতক্ষণ যে এই চিঠিখানা পড়িতে লাগিল, জানি না। পড়া শেষ হইলেও কতক্ষণ যে, এ খানিকে হাতে লইয়া বসিয়াছিলাম, তাহাও বলিতে পারি না। চিঠিখানা ললিতের হাতে ফিরাইয়া দিয়া আনমনে বলিলাম—এখন?

ললিত বলিল—এখন, যা দেখলে যা জানলে তাই। তুমি যে আমার বাড়ী, আমাকে খোঁজ করতে এসেছিলে, তা আমি জানতাম। প্রতিদিনই আমি বাড়ী ছিলাম। তোমাকে বাড়ী ঢুকতেও দেখিয়াছি। দেখা করতে ইচ্ছা হয় নাই, তাই করি নাই। আর আমার বেহারা জানে আমি কারও সঙ্গে দেখা করি না। সবাইকে এ'কথা বলে—বাবু বাড়ী নাই। তুমি ত জানই, আমার বন্ধুবান্ধবেরা সবাই বলে—আমি গোল্লায় গিয়াছি। সত্যি করে বল দেখি, তুমিও কি তাই ভাব?

কি উত্তর দিব ভাবিয়া আকুল হইলাম। বিধাতা বাঁচাইলেন। চাকর চা লইয়া আসিয়া, দরজা জানালা খুলিয়া দিল। সূর্য্য উঠি-য়াছে। ললিত বলিল—তাই ত, সারা রাত তোমায় ঘুমুতে দেই নাই।

৯

এই বৎসর পূজার সময় আবার এক মাসের ছুটি লইলাম। রাধা-মাধব বাবু, কোন্ সূত্রে বলিতে পারি না, এ খবর পাইয়া একবার কাশীতে যাইয়া তাঁর সঙ্গে দেখা করিতে লিখিলেন। আমারও সেই ইচ্ছা ছিল। পরিবারবর্গকে বৈদ্যনাথে রাখিয়া আমি কাশী চলিয়া গেলাম। রাধামাধব বাবু তাঁর গুরুদেবের ঠিকানা দিয়া, সেই খানেই যাইয়া আমায় উঠিতে লিখিয়াছিলেন। আমি সেই খানেই গেলাম। আমি তাঁহাকে প্রণাম করিয়া উঠিয়া দেখি, কল্যাণী সেখানে দাঁড়াইয়া; কোলে নয় দশ মাসের একটী ফুট ফুটে ছেলে; মুখে যেন ললিতের মুখখানি আবার কচি হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। দেখিয়া আমি চম-কিয়া উঠিলাম। কল্যাণী ছেলে কোলে লইয়াই আমাকে প্রণাম করিল। আমি বলিলাম তোমার একি অন্যায় কাজ, মামাকে যে সোণা দিয়া ভাগিনার মুখ দেখতে হয়, আমি এখন সোণা পাই কোথায়?

বিকালবেলা আনন্দস্বামী আমাকে নিভৃতে ডাকিয়া, কল্যাণী এই দেড় বৎসর কাল যে তাঁর কাছেই ছিল, সে কেন বাড়ী ছাড়িয়া চলিয়া আসে, কেন ললিতকে বলিয়া আইসে নাই, কেন পরেও কোনও সংবাদ দেয় নাই, সকল কথা বুঝাইয়া বলিলেন। আমি বলিলাম—সবই বুঝিলাম, কিন্তু ললিতের কথা ত আপনারা ভাবিলেন না, আর কল্যাণীর ভবিষ্যতের দিকেও ত চাহিয়া দেখিলেন না।

আনন্দস্বামী একটু হাসিয়া বলিলেন—সবই ভাবিয়াছি।

আমি বলিলাম—ললিতের খবর—

আনন্দস্বামী বলিলেন—সবই রাখি, সবই জানি।

আমি বলিলাম—ললিতের জীবনটা যে নষ্ট হইল, আর কল্যাণীর সংসারও উৎসন্নে গেল।

আনন্দস্বামী বলিলেন—আপনি জ্ঞানী হইয়া অমন কথা বলিবেন ভাবি নাই। সত্য কি কাউকে নষ্ট করে?

আমি চমকিয়া উঠিলাম। প্রাণের মর্ম্মস্থল পর্য্যন্ত যেন কথাগুলিতে নাড়িয়া চাড়িয়া দিল। তবু বলিলাম,—আপনি সত্য কাকে বলেন?

"প্রত্যেকের প্রকৃতিই তার একমাত্র সত্য।"

"প্রকৃতির কি ভাল মন্দ নাই?"

"প্রকৃতি যা নয়, তাই মন্দ, তা ছাড়া আর মন্দ কোথায়?"

"তবে ধর্ম্মাধর্ম্ম।"

"স্ব-ধর্ম্ম ভিন্ন আর ধর্ম্ম নাই। কল্যাণী আপনার ধর্ম্মের প্রেরণাতেই ললিতকে ছাড়িয়া আসে।"

"বুঝিলাম না।"

"বোঝা সহজ। কল্যাণী যতদিন কেবল রমণী ছিল, ততদিন ললিতের সেবাই তার শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম ছিল, যে দিন সে মা হইতেছে বুঝিল, সে দিন এই নূতন মাতৃ-ধর্ম্ম তার পূর্ব্বকার সকল ধর্ম্মাধর্ম্মকে ছাড়াইয়া, তাহাকে এক নূতন নিয়মে বাঁধিল। এরই খাতিরে সে ললিতকে ছাড়িয়া আসিয়াছে।"

"এখন?"

"ছেলে বড় হইয়াছে, স্তন ছাড়িলেই কল্যাণী আবার ললিতের কাছে যাইবে।

"আপনি কল্যাণীর ধর্ম্মটাই কেবল দেখিলেন, ললিতের কথাটা ত ভাবিলেন না।"

"ভাবিয়াছি। ললিত ধর্ম্মমতে কল্যাণীকে বিবাহ করিয়াও ধর্ম্মপত্নীত্বে কোনও দিন বরণ করে নাই। কামপত্নী করিয়াই রাখিতে

লাগিল, ললিত রস চাহিয়াছে, ভোগ চাহিয়াছে, সখ ও সুখ চাহিয়াছে, আপনাকে বহু করিয়া আত্মার যে পরম সার্থকতালাভ হয়, তাহা চাহে নাই। যে যা চায়, সংসারে সে তাই পায়। ললিত যাহা চাহিয়াছিল, তাহা পাইয়াছে।"

"কল্যাণীকে সে কি আর গ্রহণ করিবে? কল্যাণীই কি আর ললিতের জীবনের আধখানা লইয়া সন্তুষ্ট থাকিতে পারিবে?"

"না পারিলে কল্যাণী এখনও মা হইবার অধিকার পায় নাই। কল্যাণীই কি আর ললিতকে তার জীবনের সবটা দিতে পারে? এই ছেলে যে তার বড় আধখানা জুড়িয়া বসিয়াছে।

আমার বড় খটকা লাগিল। জিজ্ঞাসা করিলাম—কল্যাণী সব জানে।

"সব জানে। আপনি যে কলিকাতায় এসেছিলেন, তাও জানে।"

আমি অবাক হইয়া গেলাম। বলিলাম—আপনাদের কোনও অতিলৌকিক শক্তি আছে, নতুবা বহুতর গুপ্তচর নিশ্চয়ই আছে; নহিলে এ সব কথা আপনারা জানিলেন কেমন করিয়া?"

"উত্তর বড় সহজ। মঞ্জরীর মা আমার মন্ত্রশিষ্যা ছিলেন।" মঞ্জরী আজ এখানেই আছে। কল্যাণীর কথা সে বিশেষ কিছুই জানিত না। এখন সকল রহস্য ভেদ হইয়াছে, আর তার প্রাণের যে দিকটা খালি ছিল, কল্যাণীর সন্তানকে বুকে ধরিয়া তাহা পূর্ণ হইতেছে।

আমি আনন্দস্বামীর পায়ে পড়িয়া প্রণাম করিলাম। তিনি "নমো নারায়ণায়" বলিয়া আমাকে দুই হাত দিয়া তুলিয়া লইয়া, বুকের ভিতরে জড়াইয়া ধরিলেন। তারপর কি যে হইল জানি না!

চোখ খুলিয়া দেখিলাম—কল্যাণীর পাশে, তার ছেলেটাকে কোলে লইয়া মঞ্জরী দাঁড়াইয়া। আমি চোখ খুলিবামাত্র কল্যাণীর কোলে ছেলেটাকে দিয়া সে আমাকে আসিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিল।

আনন্দস্বামী বলিলেন—বিশ্বের পরম তত্ত্ব স্বরূপতঃ এক, রূপতঃ

দুই। এই দুই'এর এক পুরুষ আর এক প্রকৃতি। এই প্রকৃতির আবার দুইরূপ, একরূপ জগদম্বা আর একরূপ শ্রীরাধিকা, একরূপের আশ্রয়ে স্থষ্টির, আর অপরের আশ্রয়ে লীলার প্রকাশ হয়। এই তিনেতে পুরুষ আপনি আপনার পূর্ণতা সাধন করেন।

চাহিয়া দেখিলাম একদিকে কল্যাণী, আর একদিকে মঞ্জরী, আর মাঝখানে দুজনের হাত ধরিয়া দাঁড়াইয়া কল্যাণীর সন্তানটী। আমি এই অভিনব বিশ্বরূপ দেখিয়া, প্রণাম করিলাম।

আনন্দস্বামীকে জিজ্ঞাসা করিলাম—ঠাকুর এরূপ প্রকট কোথায়?

তিনি ভাবাবিষ্ট হইয়া বলিলেন—শ্রীবৃন্দাবনে।

শ্রীহরিদাস ভারতী।

প্রাচীন বাঙ্গালা নাটক

"ভদ্রার্জ্জুন অর্থাৎ অর্জ্জুন কর্ত্তৃক সুভদ্রা হরণ" বাঙ্গালা ভাষায় আদিম নাটক।* ইহার রচয়িতা তারাচরণ শীকদার। গ্রন্থখানির প্রথম পৃষ্ঠায় মুদ্রিত আছে,—

ভদ্রার্জ্জুন
অর্থাৎ
অর্জ্জুন কর্ত্তৃক সুভদ্রা হরণ।
শ্রীতারাচরণ শীকদার কর্ত্তৃক প্রণীত।
"মমৈষা ভগিনী পার্থ সারণস্য সহোদরা।
সুভদ্রা নাম ভদ্রং তে পিতুর্মে দয়িতা সুতা॥"
কলিকাতা
চৈতন্যচন্দ্রোদয় যন্ত্রে মুদ্রিত।
শকাব্দ ১৭৭৪।

গ্রন্থ প্রকাশের তারিখ দেখিলেই বুঝিতে পারা যাইবে যে ইহা অধুনা আদি বাঙ্গালা নাটক বলিয়া সাধারণতঃ বিবেচিত 'কুলীনকুল-সর্ব্বস্বের' এক বৎসর পূর্ব্বে রচিত হয়। তারাচরণ এই নাটকখানি পাশ্চাত্য নাটকের আদর্শে গঠিত করিয়াছেন। "ভদ্রার্জ্জুনের" "বিজ্ঞা-পনে" তারাচরণ লিখিয়াছেন,—

"এই পুস্তক অত্যন্ত নূতন প্রণালীতে রচিত হইয়াছে।......এই নাটক ক্রিয়াদি ও ঘটনাস্থলের নির্ণয় বিষয়ে ইওরোপীয় নাটকপ্রায় হইয়াছে, কিন্তু গদ্য পদ্য রচনার অন্যথা হয় নাই। সংস্কৃত নাটকসম্মত কয়েকজন নাট্যকারের ক্রিয়াদি গ্রহণ করি নাই। যথা প্রথমে নান্দী, তৎপরে সূত্রধার

---

* 'বিষমঙ্গল' নামক একখানি নাটকের উল্লেখ কেহ কেহ করিয়াছেন। কিন্তু ইহার কোনও গ্রন্থ পাওয়া যায় না, ও ইহা যাত্রার পালা বা নাটক তাহাও নিশ্চিতরূপে বলিতে পারা যায় না।

ও নটীর রঙ্গ-ভূমিতে আগমন, তাহাদিগের দ্বারা প্রস্তাবনা ও অন্যান্য কার্য্য এবং বিদূষক ইত্যাদি। এতদ্ব্যতিরিক্ত সংস্কৃত নাটক প্রায় ইওরোপীয় নাটক হইতে বিভিন্ন নহে। সংস্কৃত নাটক প্রথমতঃ অঙ্কে বিভক্ত, যাহাকে ইংরাজি ভাষায় (Act) একট্ কহে ; কিন্তু প্রত্যেক (Act) একট যেরূপ (Scene) সিনে বিভক্ত আছে, সংস্কৃত নাটক তাদৃশ নহে, তন্নিমিত্ত (Scene) শব্দের পরিবর্ত্তে সংযোগস্থল ব্যবহার করা গেল। যে স্থানঘটিত ক্রিয়াদি নাটকে ব্যক্ত হয়, তাহাকেই (Scene) কহে। যথা, কবিবর ভারতচন্দ্রের বিদ্যা-সুন্দর নামক গ্রন্থের প্রথমে কাঞ্চীপুরে ভট্টের গমন ও সুন্দরের সহিত তাহার কথোপকথন। যদ্যপি ঐ কাব্য নাটক প্রণালীতে রচিত হইত তবে কাঞ্চীপুরের রাজপুরী প্রথম অঙ্কের প্রথম সংযোগস্থল হইত। নাটকনির্ণীত সংযোগস্থলের প্রতিকৃতি প্রায় ইওরোপীয় নাট্যশালায় প্রদর্শিত হয়।······এই গ্রন্থ ইওরোপীয় নাটকের শৃঙ্খলানুসারে শ্রেণীবদ্ধ করিয়া প্রকাশ করিলাম।”

তারাচরণ (Scene) সিন্ বুঝাইতে ‘সংযোগস্থল’ শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন। পাশ্চাত্য নাটকে Scene শব্দ দুই প্রকার অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। নাটকের ঘটনাগুলি কোন্ দেশে ঘটিতেছে তাহা বুঝাইবার জন্য নাটকের পাত্রপাত্রীর উল্লেখের পর সেই ঘটনাস্থল বা Sceneএর উল্লেখ থাকে। উদাহরণ—সেক্সপীয়রের জুলিয়াস্ সীজার নাটকে পাত্রপাত্রীর উল্লেখের পর আছে “Scene—During a great part of the Play at Rome; afterwards at Sardis and near Philippi” (ঘটনাস্থল—নাটকের অধিকাংশ স্থলে রোম-নগরী, পরে সার্দ্দিস ও ফিলিপির নিকটবর্ত্তী প্রদেশ)। এইখানে Scene শব্দটি “সংযোগস্থল”-দ্যোতক। এই অর্থেই পরে বহু বাঙ্গালা নাটকে “সংযোগস্থল” শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। গিরীশচন্দ্র ঘোষের ‘প্রফুল্ল’ ও “বলিদান” নাটকে পাত্র-পাত্রীর উল্লেখের পর আছে ‘সংযোগস্থল—কলিকাতা’।

কিন্তু পাশ্চাত্য নাটকে Scene শব্দ আর এক প্রকার অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। প্রত্যেক অঙ্ক কতকগুলি পৃথক্ পৃথক্ অংশে বিভক্ত হয়। এই অংশগুলি আজকালকার বাঙ্গালা নাটকে ‘দৃশ্য বা

গর্ভাঙ্ক' নামে কথিত হইয়া থাকে। ইংরাজী Scene শব্দটি এই 'দৃশ্য বা গর্ভাঙ্ক' অর্থেও প্রযুক্ত হয়। তারাচরণ 'ভদ্রার্জ্জুন' নাটকে 'দৃশ্য বা গর্ভাঙ্ক' অর্থে 'সংযোগস্থল' শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন। কিন্তু এ প্রয়োগ সমীচীন নহে। পরবর্ত্তী নাট্যকারগণ যে Scne শব্দের দুইটি পৃথক্ অর্থ 'সংযোগস্থল' ও 'দৃশ্য' এই দুইটি পৃথক্ শব্দ প্রয়োগ দ্বারাই বুঝাইয়াছেন তাহাই অধিকতর সঙ্গত।

প্রসঙ্গক্রমে আমরা এইখানে বাঙ্গালা নাটকে ব্যবহৃত পারিভাষিক শব্দ সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিতেছি। "অঙ্ক" "যবনিকা" "নট" "নটী" প্রভৃতি শব্দ সংস্কৃত নাট্যশাস্ত্র হইতে গৃহীত ও প্রায় প্রাচীন-কালে যে অর্থে প্রযুক্ত হইত সেই অর্থেই ব্যবহৃত হইয়া থাকে, কিন্তু "দৃশ্য" অর্থে "গর্ভাঙ্ক" শব্দটি অদ্ভুত ধরণে বাঙ্গালা নাটকে প্রবেশ লাভ করিয়াছে। সংস্কৃত অলঙ্কার-শাস্ত্রে নাটকের মধ্যে নাটক থাকিলে শেষোক্তটিকে 'গর্ভাঙ্ক' বলা হইত। হ্যাম্‌লেটে যেরূপ নাটকের মধ্যে নাটকের অবতারণা আছে, সংস্কৃতে ভবভূতির "উত্তর-রাম-চরিত" ও রাজশেখরের "বাল-রামায়ণ" নামক নাটকদ্বয়ের মধ্যে তেমনি ক্ষুদ্র নাটকের সৃষ্টি করা হইয়াছে। ইহাকেই গর্ভাঙ্ক বলে। বিশ্বনাথ কৃত সাহিত্য দর্পণে আছে,—

> "অঙ্কোদরপ্রবিষ্টো যো রঙ্গদ্বারামুখাদিমান্।
> অঙ্কোঽপরঃ স গর্ভাঙ্কঃ সবীজঃ ফলবানপি॥"

[৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদ, ২০ শ্লোক]

উদাহরণস্বরূপ বিশ্বনাথ পূর্ব্বোক্ত বাল-রামায়ণের মধ্যে প্রযুক্ত "সীতা স্বয়ম্বর" নামক ক্ষুদ্র নাট্যের উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু বাঙ্গালা নাটকে গর্ভাঙ্ক-শব্দের এ অর্থ বজায় থাকে নাই। প্রথমে তারা-চরণ 'দৃশ্য' অর্থে 'সংযোগস্থল' শব্দ ব্যবহার করেন। তিনি 'গর্ভাঙ্ক' শব্দের অপ-প্রয়োগে দোষী নহেন। কিন্তু তাঁহার পর রামনারায়ণ তর্করত্ন নিজ-রচিত "নব-নাটক" ও "রুক্মিণী-হরণ" নাটকে 'দৃশ্য' অর্থে 'গর্ভাঙ্ক' শব্দ প্রয়োগ করেন। রামনারায়ণ সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত।

তাঁহার এইরূপ প্রয়োগ নিতান্তই বিস্ময়ের বিষয় সন্দেহ নাই। নব-নাটকে দুই-এক স্থলে গর্ভাঙ্কের বদলে 'প্রস্তাব' শব্দ ব্যবহারে রাম-নারায়ণের 'সতর্কনাং পরিচয়ং অল্পমিতং' হইতে পারে। কিন্তু তাঁহার পর হইতে তাঁহার অনুসরণে বাঙ্গালা নাটকে 'দৃশ্য' অর্থে 'গর্ভাঙ্ক' প্রচলিত হইয়া গেল।

সংস্কৃতজ্ঞ রামনারায়ণই যখন 'গর্ভাঙ্ক' শব্দের ঐরূপ প্রয়োগ করিয়া গেলেন, তখন বঙ্গের যে সকল নাট্যকার আদৌ সংস্কৃত নাট্য-শাস্ত্র পাঠ করেন নাই, তাঁহারাও যে সংস্কৃত নাট্য-শাস্ত্রে ব্যবহৃত শব্দগুলির অপ-প্রয়োগ করিবেন তাহাতে আশ্চর্য্যান্বিত হইবার কারণ নাই। ইংরাজী Prologue শব্দের অনুবাদে বাঙ্গালায় "আভাস" "প্রস্তাবনা" ও "সূচনা" প্রভৃতি শব্দ প্রয়োগ হইয়াছে। কিন্তু সংস্কৃত নাট্যশাস্ত্রে নটী, বিদূষক বা পারিপার্শ্বিকের সহিত সূত্রধারের কথো-পকথন-সম্বলিত নাটকের প্রারম্ভে প্রযুক্ত অংশকেই প্রস্তাবনা বলে। বিশ্বনাথ বলিয়াছেন—

"নটী বিদূষকো বাপি পারিপার্শ্বিক এব বা।
সূত্রধারেণ সহিতাঃ সংলাপং যত্র কুর্ব্বতে॥
চিত্রৈর্বাক্যৈঃ স্বকার্য্যোত্থৈঃ প্রস্তুতাক্ষেপিভির্মিথঃ।
আমুখং তত্তু বিজ্ঞেয়ং নাম্না প্রস্তাবনাপি সা॥"

[সাহিত্য-দর্পণ, ৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদ, ৩১, ৩২ শ্লোক]

আধুনিক বাঙ্গালা নাটকে কিন্তু নটী, সূত্রধারের কথোপকথনের অবতারণা হয় না। নাটকের প্রারম্ভে নাট্য হইতে পৃথক্ একটি দৃশ্য-কেই এখন 'প্রস্তাবনা' বলা হইয়া থাকে। গীতি-নাট্যগুলির প্রারম্ভে একটি সঙ্গীত যোজিত হইলেই তাহা প্রস্তাবনা-নাম ধারণ করে। আদিম বাঙ্গালা নাটকসমূহে সংস্কৃত নাটকের অনুরূপ প্রস্তাবনা থাকিত। পরে তাহা উঠিয়া গেল বটে, কিন্তু প্রস্তাবনা শব্দটি ভিন্ন অর্থে তাহার পরও ব্যবহৃত হইতে লাগিল। "স্বগত" "প্রকাশ্যে"

প্রভৃতি বাঙ্গালা নাটকে ব্যবহৃত নাট্যোক্তিগুলি ঠিক সংস্কৃত অর্থানুযায়ীই ব্যবহৃত হয়। বিশ্বনাথ বলিয়াছেন—

"অশ্রাব্যং খলু যদ্বস্তু তদিহ স্বগতং মতম্।
সর্ব্বশ্রাব্যং প্রকাশং স্যাদ্"

[সাহিত্য দর্পণ ৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদ, ১৩৭-৩৮ শ্লোক]

এতদ্ব্যতীত "ক্রোড়াঙ্ক" "উপসংহার" "উজ্জ্বল দৃশ্য" প্রভৃতি কতকগুলি পারিভাষিক শব্দ বঙ্গীয় নাট্যকারগণ নূতন সৃষ্টি করিয়া বাঙ্গালা নাটকে প্রয়োগ করিয়া আসিতেছেন। ইংরাজী নাটকের *Dramtis Personae*র অনুবাদ আদিম বাঙ্গালা নাটকসমূহে নিম্নলিখিত শব্দ-প্রয়োগে সাধিত হইয়াছে—"নাটক সম্বন্ধীয় ব্যক্তিগণের নাম" (ভদ্রার্জ্জুন), "নাট্যোলিখিত ব্যক্তিবৃন্দ" (নব-নাটক), "নাট্যোল্লিখিত পুরুষ ও স্ত্রীগণ" (কুলীনকুলসর্ব্বস্ব) ইত্যাদি। আধুনিক বাঙ্গালা নাটকে "চরিত্র" শব্দ দ্বারাও Dramates Personae বুঝাইবার প্রয়াস লক্ষিত হয়। গিরীশচন্দ্রের কতকগুলি নাটকে এই "চরিত্র" শব্দের প্রয়োগ দৃষ্ট হয়। সংস্কৃত নাট্যশাস্ত্র হইতে ঠিক্ Dramaatis Personaeর অনুরূপ কোনও শব্দ পাওয়া যায় নাই। কারণ, তখন নাট্যাভিনয়ে "প্রোগ্রামের" ব্যবহার ছিল না, ঐরূপ কোনও শব্দ দ্বারা নাট্যের পাত্রপাত্রীর পরিচয়ও জ্ঞাপন করান হইত না। অধিকাংশ স্থলেই একজন পাত্র প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে আর একজন তাহার সূচনা করিতেন। উত্তর-রাম-চরিতে অষ্টাবক্র চলিয়া যাইবার সময় বলিয়া যাইতেছেন "এই যে কুমার লক্ষ্মণ আস্‌ছেন"। নাটকের সর্ব্ব প্রথম দৃশ্যে যে পাত্র প্রবেশ করিত সূত্রধারই প্রস্তাবনায় তাহার বর্ণনা করিয়া দিত ; যথা,—"এই রাজা দুষ্মন্ত যেমন অতিশয় বেগবান্ মৃগ কর্ত্তৃক আকৃষ্ট হইতেছেন।" কাজেই প্রোগ্রামের প্রচলন না থাকায় সংস্কৃত নাট্যাভিনয়ে Dramatis Personaeর অনুরূপ কোন শব্দের বিশেষ প্রযুক্ত প্রয়োজন ছিল না। লিখিত নাটকগুলির পুঁথিতেও ইংরাজী নাটকের ন্যায় সর্ব্বাগ্রে পাত্রপাত্রীর তালিকা

থাকিত না, কাজেই Dramatis Personaeর অনুরূপ শব্দ প্রয়োগ সংস্কৃত নাটকে দেখা যায় না। ইহা দ্বারা অবশ্য বলিতে পারা যায় না যে, পাত্র-পাত্রীদ্যোতক কোনও শব্দ সংস্কৃত ভাষায় নাই। সংস্কৃত নাট্যসমূহের প্রস্তাবনায় বহু স্থলে "ভূমিকা" শব্দ দ্বারা নাট্যের পাত্র-পাত্রীর অংশ সূচিত হইয়াছে। আমাদের বলিবার উদ্দেশ্য এই যে, এক্ষণে Dramatis Perso nae শব্দটি যে ভাবে প্রযুক্ত হয়, প্রোগ্রামাদিতে বা নাটকের প্রারম্ভে ব্যবহারের জন্য সংস্কৃত ভাষায় সেরূপ কোনও শব্দ-প্রয়োগ আবশ্যক ছিল না বলিয়া, তাহার ব্যবহার দেখা যায় না। কাজেই প্রথমে যখন ইংরাজী নাটকের অনুকরণে বাঙ্গালা নাটকের রচনা আরম্ভ হইল, তখন বাঙ্গালী নাট্য-কারগণ সংস্কৃত নাট্যে Dramatis Personaeর অনুরূপ কোনও শব্দ না পাইয়া নিজ নিজ নাটকে "নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ" প্রভৃতি শব্দ প্রয়োগ করিয়াছিলেন। পরবর্ত্তী নাট্যকারগণ "চরিত্র" প্রভৃতি শব্দ ঐ অর্থে ব্যবহার করিয়া আসিতেছেন। সুতরাং দেখা গেল যে বাঙ্গালা নাটকে যে সকল পারিভাষিক শব্দ প্রযুক্ত হইয়া থাকে, তাহাদের মধ্যে কতকগুলি সংস্কৃত নাট্য হইতে গৃহীত, কতকগুলি নূতন সৃষ্ট। সংস্কৃত নাট্য হইতে গৃহীত শব্দগুলির কতক বা প্রাচীন অর্থেই প্রযুক্ত হইয়া আসিতেছে, আবার কতক বা নূতন অর্থ ধারণ করিয়াছে।

এক্ষণে আমরা "ভদ্রার্জ্জুন" নাটকখানির পরিচয় দিব। শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ বসু "মাইকেলের জীবনীতে" লিখিয়াছেন—"তখন বাঙ্গালা ভাষায় অভিনয়োপযোগী নাটক ছিল না। বিল্বমঙ্গল, ভদ্রার্জ্জুন প্রভৃতি যে দুই একখানি নাটক ছিল, তাহাও এরূপ কদর্য্য ভাষায় রচিত ছিল, যে পাশ্চাত্যনাটক সমূহের অভিনয় দর্শন করিয়া কাহারও আর সেরূপ নাটকের অভিনয় দর্শন করিতে বাসনা হইত না।" আমরা বিল্বমঙ্গল নাটক দেখি নাই, কিন্তু ভদ্রার্জ্জুন সম্বন্ধে যোগীন্দ্র বাবুর উক্তি সম্পূর্ণরূপে ভ্রমাত্মক। ভদ্রার্জ্জুন নাটকখানি আদৌ "কদর্য্য

ভাষায়” রচিত নহে। যে অশ্লীলতাদোষে মাইকেল, দীনবন্ধু, রামনারায়ণ তর্করত্ন প্রভৃতির নাট্যগুলি দূষিত, ভদ্রার্জ্জুনের কোথাও তাহার চিহ্নমাত্রও নাই। ১৮২১ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত রামমোহন রায় সম্পাদিত “সংবাদ কৌমুদী” পত্রিকায় তৎকালীন নাটকসমূহের দূষিত রুচির আলোচনা হইয়াছিল। যোগীন্দ্র বাবু সম্ভবতঃ এই প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া ‘ভদ্রার্জ্জুন’ নাটক না দেখিয়াই পূর্ব্বোদ্ধৃত মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু এস্থলে ইহা বিশেষভাবে উল্লেখ করিতেছি যে “সংবাদ কৌমুদী”তে ‘নাটক’ নামে যে সকল রচনা নিন্দিত হইয়াছে, ভদ্রার্জ্জুন তাহাদের অন্যতম নহে। ভদ্রার্জ্জুন নাটকের ‘বিজ্ঞাপন’ হইতেই এ কথা প্রমাণিত হইবে। ভদ্রার্জ্জুন প্রণেতা তারাচরণ লিখিয়াছেন,—

এতদ্দেশীয় কবিগণ-প্রণীত অসংখ্য নাটক সংস্কৃত ভাষায় প্রচারিত আছে এবং বঙ্গভাষায় তাহার কয়েক গ্রন্থের অনুবাদও হইয়াছে। কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই, যে এদেশে নাটকের ক্রিয়া সকল রচনার শৃঙ্খলানুসারে সম্পন্ন হয় না। কারণ কুশীলবগণ রঙ্গভূমিতে আসিয়া নাটকের সমুদায় বিষয় কেবল সঙ্গীত দ্বারা ব্যক্ত করে, এবং মধ্যে মধ্যে অপ্রয়োজনার্হ ভণ্ডগণ আসিয়া ভণ্ডামি করিয়া থাকে। বোধ হয় কেবল উপযুক্ত গ্রন্থের অভাবই ইহার মূল কারণ। তন্নিমিত্তে মহাভারতীয় আদিপর্ব্ব হইতে সুভদ্রাহরণ নামক প্রস্তাব সঙ্কলন করিয়া এই নাটক রচনা করিলাম।” [ভদ্রার্জ্জুন, বিজ্ঞাপন, ৪ পৃষ্ঠা]

উদ্ধৃত পংক্তিগুলি পাঠ করিয়া স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে, তৎকালে নাটক নামে পরিচিত গ্রন্থগুলি যাত্রা ও গীতাভিনয়েরই অধিক অনুরূপ ছিল, আমরা এখন নাটক বলিতে যাহা বুঝি তাহা ছিল না। সেকালের যাত্রা ও তারাচরণ বর্ণিত ‘নাটকে’র যথেষ্ট সাদৃশ্য আছে। তৎকালীন যাত্রায় গীতবাহুল্য ও সং’এর বাড়াবাড়ি ছিল। “সং যাত্রার অঙ্গীভূত ছিল। ……বাসুদেব ঠাকুর, সুন্দুরে জেলে, নারদ মুনি প্রভৃতি প্রথমেই হাস্যরসের উদ্রেক করিয়া আসর হইতে অবসর লইতেন।……যাত্রার…অধিকারীরা পরে আসরে অব

তীর্ণ হইতেন। তাঁহারা তখন গান জমাট করিতেন, শ্রোতৃবর্গকে ভক্তি ও করুণরসে আপ্লুত করিতেন এবং রাগরাগিণীর মূর্চ্ছনা দ্বারা মোহিত করিতেন।" [সারদাচরণ মিত্রের স্মৃতি, "সংকল্প" ১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, ৩৯-৪০ পৃষ্ঠা] "যাত্রার কেলুয়া ভুলুয়া প্রভৃতি সং ছেলেদের বিশেষ চিত্তাকর্ষক ছিল।" [জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতি, "ভারতী" বৈশাখ, ১৩২১] ইহা হইতে যদি আমরা অনুমান করি যে "সংবাদ কৌমুদী"তে ও ভদ্রার্জ্জুনের বিজ্ঞাপনে নিন্দিত 'নাটক' যাত্রা মাত্র, আমরা নাটক বলিতে এক্ষণে যাহা বুঝি তাহা নয়," তাহা অসঙ্গত হইবে না। অন্ততঃ যতদিন না ইহার বিপরীত কোনও প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে ততদিন ইহাই অধিকতর সঙ্গত বলিয়া স্বীকৃত হইবে। পূর্ব্ব প্রবন্ধে উল্লিখিত 'কলি রাজার যাত্রা' নামক গ্রন্থ "সংবাদ কৌমুদী"তে 'নাটক' বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে বটে, কিন্তু ইহার নাম হইতেই ইহা যে যাত্রা বা গীতাভিনয়, এই অনুমান অসঙ্গত নহে। যাত্রাদির ঘৃণ্য রুচি সংশোধন করিবার জন্য ইংরাজী নাটকের অনুকরণে বাঙ্গালায় নাটক রচনা আরম্ভ হয়, ভদ্রার্জ্জুনের বিজ্ঞাপন তাহার সাক্ষ্য দিতেছে। রামনারায়ণ তর্করত্নও 'রত্নাবলী'র ভূমিকায় লিখিয়াছেন,—

"সরস সংস্কৃত ও ইংরাজী ভাষার নাটকসমূহের অতুল্য রসমাধুরী অবগত হইয়া প্রচলিত ঘৃণিত যাত্রাদিতে সকলেরই সমুচিত অশ্রদ্ধা হইয়া উঠিয়াছে। নির্ম্মল সুধাকরবিনিঃসৃত সুধাধারের আস্বাদ পাইলে কাঞ্জিকাতে কাহারও অভিরুচি হয় না।"

এই সকল হইতেই বুঝা যাইবে যে রামমোহন রায় 'কলি রাজার যাত্রা'কে 'নাটক' আখ্যা দিলেও, তাহা প্রকৃতপক্ষে নাটক কি যাত্রা, তদ্বিষয়ে বিলক্ষণ সংশয় আছে। কারণ তৎকালে 'নাটক' শব্দটি যাত্রার অভিনয়ার্থ রচিত গ্রন্থ সকলে ও প্রযুক্ত হইত। পূর্ব্বোদ্ধৃত ভদ্রার্জ্জুনের ভূমিকায় 'নাটক' বলিয়া যে সকল পুস্তক বর্ণিত হইয়াছে, তাহা যাত্রা বা গীতাভিনয় ব্যতীত আর কিছুই নহে। যাত্রা, "কবি" প্রভৃতি প্রাচীনকালের নাট্যাভিনয় অশ্লীলতা দোষে প্রায়ই দূষিত হইত।

কাজেই শিক্ষিত জনসাধারণের প্রাণে ক্রমে এসকল অভিনয়ের প্রতি বিরাগের সঞ্চার হইল। এই বিরাগ এতদূর বদ্ধমূল হইল যে, কবিত্বপূর্ণ অথচ অশ্লীলতাবর্জ্জিত "কবি" "পাঁচালী" প্রভৃতির পালাও কেবল "পাঁচালী" ও "কবি" বলিয়া ঘৃণিত হইতে লাগিল। অবশ্য আসর বুঝিয়াই পাঁচালী বা কবিওয়ালাগণ খেউড়ের অবতারণা করিতেন। কিন্তু পাশ্চাত্য নাট্যকলার আস্বাদ পাওয়াতে ক্রমশঃ অশ্লীলতাশূন্য পাঁচালী বা কবির পালাও বাঙ্গালীর চিত্তরঞ্জনে সক্ষম হইল না। আজ তাই গ্রামে গ্রামে পল্লীতে পল্লীতে সখের নাট্য-সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। পাঁচালী, কবি প্রভৃতি বিলুপ্ত হইতে বসিয়াছে। যাত্রাও ক্রমে ক্রমে থিয়েটারের মতই হইয়া উঠিতেছে।

সে যাহা হউক, এই কুরুচিপূর্ণ যাত্রার পরিবর্ত্তে বিশুদ্ধ নাটক অভিনয়ে শিক্ষিত দর্শক সন্তুষ্ট হইবেন, এই আশায় তারাচরণ শীকদার 'ভদ্রার্জ্জুন' নাটক প্রণয়ন করিয়াছিলেন। ইংরাজী নাটকের Prologueএর ন্যায় ভদ্রার্জ্জুনে একটি 'আভাস' সংযুক্ত হইয়াছে। তাহাতে তারাচরণ নাটক ও নাট্যকলার নিম্নলিখিত প্রশংসা করিয়াছেন :—

"সকল কাব্যের মধ্যে নাটক প্রধান।
সর্ব্বস্থলে নাটকের আদর সমান॥
সভ্য কি অসভ্য জাতি পৃথিবী-নিবাসী।
এ রস দর্শনে হয় সবে অভিলাষী॥
দর্শকমণ্ডল-মাঝে করিয়া বিস্তার।
করিতেছি সুধাসম-নাটক-প্রচার॥
শ্রুতিযুগে দৃষ্টিযুগে প্রবেশি এ সুধা।
তৃপ্তি করে সকলের নিরানন্দ-ক্ষুধা॥"

এইরূপে নাট্যকলার প্রশংসা করিয়া নাট্যকার সমগ্র নাটকের সংক্ষিপ্ত উপাখ্যানটী 'আভাসে' পয়ারে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। 'আভাসে'র পরই প্রকৃত প্রস্তাবে নাটক আরম্ভ হইয়াছে।

শ্রীশরচ্চন্দ্র ঘোষাল এম্, এ।

বিরহে

এমন বাদল-দিনে
কোন মথুরায়,
আমার পরাণ ল'য়ে,
গেল শ্যামরায়।
সেথা কি মধুর নিশি
আঁধারে গিয়েছে মিশি'?
এমনি পাগল পারা
নেমেছে বাদল ধারা?
তা'রো কি নয়ন-দুটি
আঁখি জলে ছায়?
এমন আঁধার বায়
নিঠুর বিজুলী-ঘায়,
তারো কি বিজন-হিয়া,
উঠিতেছে শিহরিয়া?
সেও কি চমকি উঠি
পথপানে চায়?
সখি, এমন বাদল দিনে,
কোথা শ্যামরায়?

শ্রীসুধীরঞ্জন দাস।

শ্রীশ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব

২

যে শ্রীকৃষ্ণের কথা এই শেষ-বয়সে, শুনিতে ও বলিতে এমন আনন্দ পাই, গুরুকৃপায় এই ইন্দ্রিয়গ্রাম ও মনোবৃত্তি-সকল, আপন আপন প্রকৃতির অনুসরণে এই সংসারের বিচিত্র বিষয়-রস ভোগ করিতে করিতেই ক্রমে যে শ্রীকৃষ্ণের সন্ধান পাইয়াছে, সেই শ্রীকৃষ্ণ পুরাণের শ্রীকৃষ্ণ নহেন, কিন্তু তত্ত্বের শ্রীকৃষ্ণ। মহাপ্রভু-প্রবর্ত্তিত সিদ্ধান্তেও ইঁহাকে তত্ত্ববস্তুরূপেই প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে।

অদ্বয়-জ্ঞান তত্ত্ববস্তু কৃষ্ণের স্বরূপ

ইহাই মহাপ্রভুর কথা। ইহাই আমার এই সামান্য কৃষ্ণকথারও মূলসূত্র। তবে এই সিদ্ধান্তকে ধরিয়াই যে আমি কৃষ্ণতত্ত্বের সন্ধান পাইয়াছি, এমন নয়। অন্তরে গুরুকৃপায় শ্রীকৃষ্ণের সন্ধান পাইয়াই মহাপ্রভুর সিদ্ধান্তের প্রকৃত মর্ম্ম বুঝিয়াছি।

আর এই সিদ্ধান্তের মর্ম্ম বুঝিয়াই দেখিলাম, মহাপ্রভুর কথা লোকে ধরিতে পারে নাই। তিনি বলিলেন প্রত্যক্ষ তত্ত্বের কথা, লোকে শুনিল কেবল পুরাতন কিম্বদন্তীর দূরাগত প্রতিধ্বনি। তিনি দেখাইলেন চিদ্বস্তু, তারা দেখিল কেবল পৌরাণিকী প্রতিমা। তিনি প্রকট করিলেন ভগবানের নিত্য-লীলা, তারা ভাবিতে লাগিল কেবল দ্বাপরের পুরাণ-কাহিনীর কথা। এই বাঙ্গালার, উড়িষ্যার, তৈলঙ্গ-দেশের ও দক্ষিণাপথের মাঠে ঘাটে তিনি আবিস্কার করিলেন অদৃষ্ট-পূর্ব্ব চিন্তামণিময়ী ব্রজভূমি, ভারতের এক কোণে যে সামান্য পরিসর বনভূমিকে লৌকিকী কিম্বদন্তী বলিত শ্রীবৃন্দাবন, তারা চলিল ব্রজের ধূলি মাখিতে, কেবল সেইখানে। তিনি বলিলেন, কৃষ্ণের—

"বিভূতি দেহ সব চিদাকার"

তারা মাটি দিয়া, ধাতু গালিয়া, পাথর খুঁদিয়া গড়িতে লাগিল—নব-নটবর শ্যামসুন্দর। মহাপ্রভু, "নূতন" ভক্তি বিলাইবার জন্য নূতন ভাবের হাট খুলিলেন,—আর জগতের সকল মহাপুরুষেরা যাহা করেন, তিনিও তাহাই করিলেন,—পুরাতন ও প্রচলিত ভাষা দিয়াই এই নূতন ভাবকে সাজাইয়া লোকের নিকটে ধরিলেন। তাঁর ভাবসম্ভার ছিল অজ্ঞাতপূর্ব্ব, এই ভাষার সাজ ছিল চিরপরিচিত। ভাব তাঁর ধরিল সাড়ে তিনজন, ভাষা তাঁর গিলিল লক্ষ লক্ষ লোকে। এই সাড়ে তিনজন খাঁটি বৈষ্ণবের তিরোভাবে মহাপ্রভুর সেই "অভিনব" ভক্তিভাব, নিরাধার হইয়া, যেখান হইতে আসিয়াছিল সেইখানেই উড়িয়া গেল, পড়িয়া রহিল কেবল ঐ প্রাচীন প্রাণহীন ভাষা, আর সেই লক্ষ লক্ষ অবোধ লোক। আর তাহারা সেই শূন্যগর্ভ শব্দ-রাশিতে আপনাদিগের চিরাগত সংস্কারকে পূরিয়া দিয়া তাহাকেই মহাপ্রভু-প্রবর্ত্তিত পন্থা বলিয়া ধরিল। মহাপ্রভু যে বীজ বপন করিয়াছিলেন, তার অঙ্কুরোদ্গম হইল না। কিন্তু সে বীজ অক্ষয়, তাহা কদাপি নষ্ট হইবার নহে। সেই অক্ষয় বীজকে ফুটাইবার জন্যই ভারতের, বিশেষতঃ এই বাঙ্গালা দেশের, আধুনিক ইতিহাসের অভিব্যক্তি।

যে নিবিড় কল্পনাজাল মহাপ্রভু-প্রবর্ত্তিত সহজ সাধনকে একেবারে আচ্ছন্ন করিয়া বসিয়াছিল, ইংরাজি শিক্ষা ও আধুনিক য়ুরোপীয় সাধনা তাহাকে ছিন্ন ভিন্ন করিয়াছিল। যে বৈদান্তিক মায়াবাদ কেবল জীব-ব্রহ্মের ভেদই উড়াইয়া দিতে চাহে নাই, কিন্তু এই ভেদ উড়াইতে যাইয়াই জগৎকে মিথ্যা ও সংসারের সর্ব্ববিধ রসের সম্বন্ধকে বন্ধন-হেতু বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিয়াছে, বৈষ্ণবেরা তত্ত্বমীমাংসায় তাহাকে বর্জ্জন করিয়াও, ধর্ম্মসাধনে প্রকৃত পক্ষে অতিক্রম করিতে পারেন নাই। আর পারেন নাই বলিয়াই, সত্যভাবে মহাপ্রভুর পথও ধরিতে পারি-লেন না। য়ুরোপীয় বিজ্ঞান ও দর্শন, বিশেষতঃ প্রাচীন গ্রীশীয় ললিত-

কলার জীবন্ত রক্তমাংসের প্রবলপ্রেরণা, সেই মায়ার প্রভাবকে একেবারে নষ্ট করিয়া দিতে লাগিল। য়ুরোপের সংস্পর্শে আসিয়া আর যাহা কিছু পাইয়া বা খোয়াইয়া থাকি না কেন, তাহাতে যে এই প্রত্যক্ষ জগৎকে এবং আমাদের প্রতিদিনের কর্ম্মাকর্ম্মকে ও সংসারের সর্ব্ববিধ রসের সম্বন্ধকে সজীব, সতেজ ও সত্য করিয়া তুলিয়াছে, একথা অস্বীকার করা অসম্ভব। আর য়ুরোপের শিক্ষা-দীক্ষার প্রভাবে, এই সংসারটা এমন সত্য হইয়া উঠিয়াছে বলিয়াই, মহাপ্রভুর অভিনব ভক্তিপন্থাটিও দিন দিন উজ্জ্বল হইতেছে।

এই ভক্তির পথ সংসারের পথ, সন্ন্যাসের পথ নহে। আর যুগ-যুগান্ত ধরিয়া ভারতের সভ্যতা ও সাধনা একান্ত সংসার-বিমুখ ও পরলোক-সর্ব্বস্ব হইয়াছিল বলিয়াই, আমাদিগের পূর্ব্ব-পুরুষেরা মহা-প্রভুর উপদেশ শুনিয়াও তার মর্ম্ম বুঝিতে পারেন নাই। আমাদের দেশের ধর্ম্মকর্ম্ম ও সাধন ভজন সকলই, বহুদিন হইতে, সংসার ও সংসারের বিবিধ সম্বন্ধকে উচ্চতম আধ্যাত্মিক আদর্শ হইতে একান্ত পৃথক্ করিয়া রাখিয়াছিল। সংসার মায়ার খেলা; প্রবৃত্তিবশে লোকে সংসার করে, করুক; কিন্তু এ মায়ার বন্ধন না কাটিলে কখনও পরম-পুরুষার্থ লাভ হয় না। ইহাই লোকের ধারণা ছিল। সংসার-বিমুখ সাধনভজন জীবকে কৈবল্যের পথেই লইয়া যাইতে পারে। প্রকৃত ভক্তির পথ সন্ন্যাসের পথ নহে, সংসারেরই পথ, লোকে এ সকল কথা জানিত না ও বুঝিত না। কৈবল্যের সাধ্য নিগুর্ণব্রহ্ম; ভক্তির উপজীব্য সর্ব্বগুণাধার ভগবান। কৈবল্যসাধক চাহেন সকল সংসার-বন্ধন কাটিয়া, সর্ব্বসম্বন্ধাতীত ও সর্ব্বোপাধিশূন্য হইয়া, নিগুর্ণ ও নিরুপাধি ব্রহ্মস্বরূপে মিলিয়া গিয়া অদ্বৈতসিদ্ধি লাভ করিতে। ভক্তের প্রাণ চাহে ভগবানের সঙ্গে বিবিধ রসের সম্বন্ধ পাতিয়া, তাঁহাকে পিতা, সখা, পুত্র বা প্রণয়ীরূপে ভাবিয়া, দাস্য, সখ্য, বাৎ-সল্য বা মধুর রসে বিভোর ও আত্মহারা হইয়া, সর্ব্বেন্দ্রিয়ের দ্বারা নিখিলরসামৃতমূর্ত্তির—তাঁহার সেবা করিতে। কৈবল্য চাহে সর্ব্ব

সম্বন্ধের উচ্ছেদ করিয়া ব্রহ্মের সঙ্গে একাত্ম হইতে। ভক্তি চাহে সংসারের সকল সম্বন্ধকে বজায় রাখিয়া ও পূর্ণ করিয়া, সকল রসকে ইন্দ্রিয়ের ভিতর দিয়াই অতীন্দ্রিয়ের ভূমিতে তুলিয়া লইয়া, নিত্যকাল এই সকল রসের সম্বন্ধের সাধন করিয়া শ্রীভগবানের লীলার সহায় হইতে। মহাপ্রভু এই কৈবল্যমুক্তির অপূর্ণতা ও এই মায়াবাদের ভ্রান্তি দেখাইয়া জীবকে সত্য ভক্তির পথে লওয়াইবার জন্যই আসিয়াছিলেন। "আপনি আচরিয়া," তিনি "কলির জীবকে" এই "অনর্পিতচরী" ভক্তির পথই দেখাইয়া গিয়াছেন। অবতার মাত্রেই অসুরবধ করেন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু এই মায়াবাদরূপ অসুরকে নষ্ট করিলেন। কিন্তু এ অসুর মরিয়াও মরিল না। লোকে ভক্তির কথা শুনিল, কিন্তু মুক্তির লোভ ছাড়িতে পারিল না। যাহারা হরি-নাম পাইল, জপযজ্ঞে দীক্ষিত হইল, মুখে—

হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব, নাস্ত্যেব, নাস্ত্যেব গতিরন্যথা—

বলিতে লাগিল, তাহারাও বাহ্য-ক্রিয়াকলাপ ও তান্ত্রিক শান্তিস্বস্ত্যয়ন ছাড়িল না। তারা নামও করিতে লাগিল, কাপড়ও তুলিতে ভুলিল না। যারা মহাপ্রভুকে স্বীকার করিল, নিত্যানন্দের আশ্রয় লইল, তারাও তিলক কণ্ঠী ধারণ করিয়া ভেক লইয়া সংসার ছাড়িয়া চলিয়া গেল। যারা গৃহী হইয়া রহিল, তারাও সংসারের প্রত্যক্ষ ও জীবন্ত সম্বন্ধের মধ্যে, দাস্যসখ্যবাৎসল্যাদি রস সাধন করিয়া নিখিলরসামৃতমূর্ত্তি ভগবানকে পাইল না। আর না পাইয়া এ সকলকে মায়িক বলিয়া উপেক্ষা করিয়া কল্পিত প্রতীকাদি ধরিয়া এই সকল রস-সাধনে নিযুক্ত হইল। লোকে মহাপ্রভুর এই অন-র্পিতচরী ভক্তি পাইল না। আর তাঁর আবির্ভাবের সার্থকতাসম্পা-দনের জন্যই মনে হয় ইংরাজের শাসন-দণ্ডে ভয় করিয়া, সংসার-রস-বিভোরা, প্রত্যক্ষপরায়ণা য়ুরোপীয়সাধনা আসিয়া আমাদের দ্বারে দ্বারে, অজ্ঞাতসারে, সেই রসই বিলাইতে লাগিল। শয়তানের

দূত হইয়া নহে, কিন্তু শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর কিঙ্করররূপেই য়ুরোপ আমাদের কাছে আসিয়াছে।

সংসার ও পরমার্থের মধ্যে বিরোধ সকলদেশের সকল প্রাচীন ধর্ম্মেই দেখিতে পাওয়া যায়। জগতে এ পর্য্যন্ত এ বিরোধের নিঃশেষ নিষ্পত্তি হয় নাই। কেহ বা সংসারকে ছাড়িয়া পরমার্থ খুঁজিয়াছে, কেহ বা পরামর্থকে ছাড়িয়া সংসারে মজিয়াছে; আর কেহ বা সংসার ও পরমার্থের মধ্যে, তদর্দ্ধং মদর্দ্ধং করিয়া, একটা গোঁজামিল দিয়া চলিয়াছে, কিন্তু এ দু'এর সম্যক্ সমন্বয় এ পর্য্যন্ত কোন ধর্ম্মে করিয়াছে বলিয়া জানি না। মহাপ্রভুই কেবল এই সমন্বয়ের পথ দেখাইয়াছেন। ইন্দ্রিয়ের সেবা মানুষ চিরদিনই করিয়াছে। কেহ কেহ এই প্রাকৃত ইন্দ্রিয়-সেবাকেই ধর্ম্মের অঙ্গ করিয়াও লইয়াছে। বামাচার কেবল ভারতবর্ষেই প্রবর্ত্তিত হয় নাই। মিশরে, গ্রীশে, সকল—প্রায় সকল প্রাচীন দেশেই, কোনও ন কোনও সময়ে, কোনও না কোন আকারে, এই কদাচার প্রবল হইয়াছে। মহাপ্রভু এই কদাচারের সমর্থন বা প্রতিষ্ঠা করেন নাই কিন্তু ভগবদারাধনায় এ সকল ইন্দ্রিয়কে একেবারে বর্জ্জনও করেন নাই। কেবল এই সকল রসের করণকে নির্ম্মল করিয়া, শুদ্ধ করিয়া, তাহাদের ভিতরে যে অতীন্দ্রিয়-সংকেত আছে, তাহাকে ফুটাইয়া তুলিয়া, সকলরসাধার ভগবানের সেবাতে প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন। পূর্ব্বতম সাধকেরা ঈশ্বরে পরানুরক্তিকেই ভক্তি বলিয়া গিয়াছিলেন। মহাপ্রভু বলিলেন—রস ভিন্ন অনুরাগ কোথায়? শুদ্ধ রসের সম্বন্ধেতেই কেবল সত্য ও অহৈতুকী অনুরাগ ফুটিয়া উঠে। শ্রেষ্ঠ অনুরাগ লাভ করিতে হইলে, শ্রেষ্ঠরসাস্বাদন আবশ্যক। ভগবানেতে এই শ্রেষ্ঠ অনুরাগ অর্পণ করিতে হইলে, তাঁহাকে শ্রেষ্ঠরসের আশ্রয় বা বিষয়রূপে ধরিতে হইবে। অতএব কেবল "সা পরানুরক্তিরীশ্বরে"—বলিয়া ভক্তির সংজ্ঞা দিলে চলিবে না। এ ভক্তি প্রাচীন ভক্তি। এ ভক্তি উপনিষদের ঋষিগণ, শুকনারদাদি

ভাগবতেরা পূর্ব্বে আচরণ করিয়া গিয়াছেন। এ ভক্তি অনর্পিত-চরী নহে। যে ভক্তি পূর্ব্বে কেউ কোনও দিন আচরণ করে নাই, মহাপ্রভু জীবকে তাহাই বিলাইতে আসিয়াছিলেন। এই অনর্পিতচরী ভক্তির নূতন সংজ্ঞা প্রয়োজন। তাই—

"হৃষীকেন হৃষীকেশসেবনং ভক্তিরুচ্যতে"

অনর্পিতচরী ভক্তির এই সংজ্ঞা হইল। ইন্দ্রিয়ের দ্বারা, ইন্দ্রিয়ের অধীশ্বরের সেবাই ভক্তি।

উপনিষদ্—

কেনেষিতং পততি প্রেষিতং মনঃ
কেনঃ প্রাণঃ প্রথমঃ প্রৈতি যুক্তঃ
কেনেষিতাং বাচমিমাং বদন্তি
চক্ষুঃ শ্রোত্রং ক উ দেবো যুনক্তি—

"মন কাহার দ্বারা প্রেরিত হইয়া আপন বিষয়ের প্রতি গমন করে? শরীরের অভ্যন্তরে প্রধানরূপে বর্ত্তমান প্রাণ, কাঁহাকর্ত্তৃক নিযুক্ত হইয়া নিজ বিষয়ের প্রতি গমন করে? কাঁহার চালনায় লোকে এই সকল বাক্য উচ্চারণ করে, এবং কোন দেবতাই বা চক্ষু ও কর্ণকে নিজ নিজ বিষয়ে নিযুক্ত করেন,—বলিয়া যে বস্তুকে নির্দ্দেশ করিয়াছিল, এবং ক্রমে

"সর্ব্বেন্দ্রিয়গুণাভাসং সর্ব্বেন্দ্রিয়বিবর্জ্জিতং"

সকল ইন্দ্রিয় বিবর্জ্জিত হইয়াও যিনি সকল ইন্দ্রিয়ের গুণাভাস—বলিয়া যে তত্ত্বের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল, তিনিই হৃষীকেশ। এ সকল ইন্দ্রিয়ের নিয়ন্তা যখন তিনি এ সকল ইন্দ্রিয়ের সার্থকতাই বা তাঁহাতে ভিন্ন আর কোথায় হইতে পারে? তাঁর সেবার জন্য ইন্দ্রিয়-গ্রামকে নিষ্পেষিত করিতে হয় না, যথাযথভাবে বিকশিত করিয়াই তুলিতে হয়। প্রাচীন সন্ন্যাস-মুখী সাধনা, যে ইন্দ্রিয় সকলকে সাধনার বৈরী ভাবিয়া নির্য্যাতন করিয়াছিল, মহাপ্রভু সেই ইন্দ্রিয়গ্রামকেই সাধনের সহায়রূপে প্রতিষ্ঠিত করিলেন।

সংযমে শক্তি বাড়ে, অসংযমে ও উচ্ছৃঙ্খলতায় শক্তি নষ্ট হয়। ইন্দ্রিয়ের শক্তির বৃদ্ধির জন্য সংযম চাই। অনুশীলন ব্যতীত বিকাশ অসম্ভব। ইন্দ্রিয়ের বিকাশের জন্য অনুশীলন চাই। এই অনুশীলনের পথ, অনেক পশুদেরও ইন্দ্রিয় আছে, তারাও নিজ নিজ ইন্দ্রিয়ের অনুশীলন করে। এ পথ পাশব। তারা ইন্দ্রিয়ের অনুশীলন করে "অবশং প্রকৃতের্বশাৎ"—প্রকৃতির প্রেরণায়, অবশেই তারা যন্ত্রারূঢ়ের মতন বিষয় রাজ্যে চলাফেরা করিয়া থাকে। আর, এক দিক দিয়া দেখিলে মানুষকে কেবল শ্রেষ্ঠ পশুরূপেই দেখিতে পাওয়া যায়। এই শ্রেষ্ঠ পশুরূপী মানুষের একটা ইংরাজি নাম হইয়াছে। ইংরাজিতে আমরা ইহাকে mere man (মিয়ার ম্যান্) বলিয়া থাকি। কেবল মাত্র বুদ্ধির দিক দিয়াই এই মিয়ার ম্যান্ পশু অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। এই মানুষ প্রাকৃত-বুদ্ধি-সম্পন্ন। ইহার অতীন্দ্রিয়ের অনুভূতি ফোটে নাই। সে এখনও আপনাকে আত্মা স্বরূপ বলিয়া জানে নাই। এই প্রাকৃত মানুষের ইন্দ্রিয়ানুশীলন, বিষয়ের প্রেরণায় চলিয়া, বিষয়ের সীমাতেই পড়িয়া থাকে। এই ইন্দ্রিয়ানুশীলন প্রত্যক্ষের উপরে উঠে না। ইন্দ্রিয়ানুশীলনের এ পথকে প্রাকৃত মানুষের পথ বলা যাইতে পারে। এই পথেও হৃষীকেশের সন্ধান পাওয়া যায় না। যে ইন্দ্রিয়ের ভিতরে অতীন্দ্রিয়ের সাড়া জাগিয়াছে, তারই দ্বারা কেবল হৃষীকেশের ভজনা সম্ভব হয়। যে ইন্দ্রিয়ানুশীলনের মধ্যে উচ্চাঙ্গের ললিতকলার উদ্দীপনা নাই, তাহা ভক্তিসাধনের উপযোগী হয় না। তাহাতে রূপের মধ্যে অরূপকে, সান্তের মধ্যে অনন্তকে, সংসারের মধ্যে পরমার্থকে, ধরা যায় না। আর রূপের ভিতরে যে অরূপের সাক্ষাৎকার লাভ করে নাই, যে ভাবাঙ্গের সাহায্যে হৃষীকের দ্বারা হৃষীকেশের সেবা করিতে হয়, সে ভাবাঙ্গগঠন তার পক্ষে অসম্ভব। এই ভাবাঙ্গস্ফূর্ত্তিকেই ইংরাজিতে idealisation কহে।

এই ভাবাঙ্গ-স্ফুরণ বা idealisation ধর্ম্মসাধনে নূতন কথা নহে।

স্বল্পবিস্তর সকল ধর্ম্মেতেই এই ভাবাঙ্গস্ফূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। বস্তুতঃ এই ভাবাঙ্গস্ফূর্ত্তি ব্যতীত জীবের অতীন্দ্রিয়ানুভূতি জাগে না; আর কোনও না কোনও আকারে অতীন্দ্রিয়ানুভূতি না জাগিলে, কোনও ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠাই হইতে পারে না। কিন্তু প্রাচীন ধর্ম্ম সাধনে এই ভাবাঙ্গের স্ফুরণ কল্পিত ছিল, সত্যোপেত ও বস্তুতন্ত্র হয় নাই। প্রত্যক্ষের উপরে ভাবাঙ্গের প্রতিষ্ঠা হয় নাই, মানস-কল্পনার উপরেই হইত। কোনও কোনও স্থলে ললিতকলাতে এ সকল ভাবাঙ্গ সম্পূর্ণ বস্তুতন্ত্র হইলেও, ধর্ম্মসাধনে চিরদিনই স্বল্পবিস্তর কল্পিত ছিল। মহাপ্রভু ভাবাঙ্গসাধনে এই কল্পনার প্রভাবকে নষ্ট করিয়া, ভক্তিকে প্রত্যক্ষ রসের উপরে গড়িয়া তুলিয়া বস্তুতন্ত্র

"হৃষীকেন হৃষীকেশসেবনং ভক্তিরুচ্যতে"

করিলেন। কিন্তু লোকে মুখে এই কথার আবৃত্তি করিয়াও, ইহার মর্ম্ম ধরিল না।

য়ুরোপীয় সাধনা আসিয়া, এতদিন পরে, আমাদিগকে এই ভক্তি-পথের সন্ধান দিয়াছে। য়ুরোপ এই অনর্পিতচরী ভক্তির কথা কিছুই জানে না। কিন্তু ললিতকলার মধ্যে অপূর্ব্ব ভাবাঙ্গ গড়িবার সংকেতটী সুন্দররূপে সাধন করিয়াছিল। গ্রীশের ললিতকলাতে একদিকে যেমন অপূর্ব্ব বস্তুতন্ত্রতা দেখিতে পাইলাম, অন্যদিকে সেই-রূপ অদ্ভুত ভাবাঙ্গ-স্ফূর্ত্তিও প্রত্যক্ষ করিলাম। গ্রীশীয় ললিতকলার ভাবাঙ্গস্ফূর্ত্তি বা idealisation বস্তুতন্ত্রহীন নহে। জড়ের ভিতরে গ্রীশ অজড়কে, প্রত্যক্ষের উপরে অপ্রত্যক্ষকে, চাক্ষুষ রক্তমাংসের আকার ও বর্ণের মধ্যেই অচাক্ষুষ আত্মবস্তুকে যেমন ফুটাইয়াছিল; এ পর্য্যন্ত আর কোথাও তেমন দেখি নাই। ভারতের তত্ত্বজ্ঞান বা আত্মজ্ঞান য়ুরোপে ফুটিয়া উঠে নাই। কিন্তু এই বস্তুতন্ত্র ভাবাঙ্গ-স্ফূর্ত্তি-নিবন্ধন, এই idealisation'এর প্রভাবে, য়ুরোপীয় সাধনা মানুষকে পশুত্বের ভূমি হইতে তুলিয়া শ্রেষ্ঠতম মানবতার ভূমিতে প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিয়াছে, এ কথা অস্বীকার করা যায় না। মানুষকে

য়ুরোপ এখনও দেবতা করিয়া তুলে নাই। জীবে শিববুদ্ধি য়ুরোপের এখনও জন্মে নাই। এখনও সর্ব্বজীবে তার ব্রহ্মভাবোদয় হয় নাই। আমাদের সাধনা ইহা করিয়াছে। কিন্তু করিয়াছে বেশীভাগ কেবল কল্পনার রাজ্যে, বস্তুর রাজ্যে করিতে পারে নাই। আমরা কল্পনা-জগতে মানুষকে দেবতা করিয়াছি, য়ুরোপ বাস্তব জগতে মানুষকে সত্য জীবন্ত মানুষ করিয়া গড়িয়া তুলিতে চাহিয়াছে। য়ুরোপীয় সাধনার ভাবাঙ্গস্ফূর্ত্তি বা idealisation বস্তুতন্ত্র, কল্পিত নহে। আর এই জন্যই এই সাধনা অজ্ঞাতসারে মহাপ্রভু প্রচারিত অনর্পিতচরী ভক্তির পথ ক্রমে প্রশস্ত ও উজ্জ্বলতর করিয়া দিতেছে।

য়ুরোপীয় সাধনার প্রেরণায়, জগতের প্রত্যক্ষ রূপ রসাদির অনুসরণ করিয়াই ক্রমে কৃষ্ণপথের সন্ধান পাইয়াছি। এই জন্যই আমাদের শ্রীকৃষ্ণ পৌরাণিকী কাল্পনার শ্রীকৃষ্ণ নহেন, কিন্তু তত্ত্বের শ্রীকৃষ্ণ। আর কৃষ্ণবস্তু যে তত্ত্ববস্তু এই গোড়ার কথাটা ভুলিয়া গেলে, আমাদের এই প্রত্যক্ষপ্রধান বৈজ্ঞানিক যুগে, কেউ কথনও শ্রীকৃষ্ণকে বুঝিতে ও ভজিতে পারিবে বলিয়া মনে হয় না।

শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল।